সমুদ্রগুপ্ত

লেখক

লল্লনজী গোপাল

অনুবাদক

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়া দিল্লী

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

SAMUDRAGUPTA
(*Bengali*)

সচিব, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী-১৩ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

আদিযুগ থেকেই এদেশে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, অসাধারণ নরনারীদের আবির্ভাব হয়েছে। কলা, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁদের মহত্বপূর্ণ দান রয়েছে—এই রকম মহান ব্যক্তিদের নামে আমাদের ইতিহাস ভরে আছে। এঁদের মধ্যে অনেকের নামই লোকেরা জানেন, কিন্তু এঁদের জীবনবৃত্তান্ত এবং কাজের সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ কিছু জানেন না। নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছিলেন, এমন অনেক মণীষি জন্মেছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের কিছুমাত্র পরিচয় নেই।

কোনো দেশের ইতিহাস, সে দেশের নরনারীর ইতিহাস। তাঁরাই সে ইতিহাস গড়েছেন, তাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বিকশিত করেছেন। এই মহামানবদের সম্বন্ধে কিছু জানা, এবং তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে কিভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে—তা উপলব্ধি করা জনসাধারণের কর্তব্য।

অনেক দেশে এই উদ্দেশ্যেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী প্রকাশিত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ রকম জীবনচরিত বিশেষ নেই। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীণ তথ্যপূর্ণ বই প্রকাশিত করা এই জীবনচরিতমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই—দেশের মহান স্ত্রীপুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য এবং সরস রূপে প্রকাশিত করতে।

ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা প্রকাশিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই বইখানিতে সুপণ্ডিত লেখক শ্রীলল্লনজী গোপাল

ভূমিকা

সমুদ্রগুপ্তের জীবন এবং তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে লিখেছেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতের একটি খুব বড় অংশ তাঁর শাসনের অধীনে এসেছিল। তাঁর যশ এবং প্রতাপ কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে সীমিত ছিল না, লঙ্কা এবং অন্যান্য দ্বীপেও তাঁর যশগৌরব পৌঁছেছিল। যবদ্বীপে রচিত একটি পুস্তকে সমুদ্রগুপ্তকে একজন আদর্শ রাজা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শুধু প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী এবং কুশল শাসনকর্তা ছিলেন না, কবি এবং শিল্পীও ছিলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য অনেকেই তাঁকে 'পূর্ণমানব' বলেছেন। সেই যুগের দৃষ্টিতে তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছিল। অনেকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর তুলনা ক'রে থাকেন।

এই পুস্তকমালা সম্পাদনের ভার নেওয়ার জন্য আমি অধ্যাপক কে. স্বামীনাথন্ এবং শ্রীমহেন্দ্র দেশাই-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

বালকৃষ্ণ কেসকর

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	বিষয় প্রবেশ	...	১
২।	সমুদ্রগুপ্ত (পটভূমিকা)	...	৩
৩।	সিংহাসন প্রাপ্তি	...	১৫
৪।	বিজেতা	...	২৯
৫।	সাম্রাজ্য প্রসার	...	৪৯
৬।	ব্যক্তিত্ব	...	৬৭

বিষয় প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার এবং পৌত্র অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি অটুট রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পরেই ভারতীয় ইতিহাসের চিরন্তন ধারা কেন্দ্রীকরণের আদর্শ আর বিকেন্দ্রীকরণের দৌর্বল্যের মধ্যে সংঘর্ষরূপে প্রকট হতে দেখা যায়। ঐ যুগে ভৌগোলিক অসুবিধা এবং যাতায়াতের অনুন্নত ব্যবস্থার জন্য দূর প্রদেশগুলির দূরতম সীমা পর্যন্ত এক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই কঠিন ছিল। অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক এবং দিগ্বিজয়ীদের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব হত। কিন্তু এরূপ মহান ব্যক্তিত্ব সর্বদা হ'ত না, ফলে যোগ্য শাসকের অভাবে দেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেত। ভৌগোলিক বিভেদের ফলে উৎপন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি সুবিধা পেলেই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করত। ইতিহাসের এই সাধারণ নিয়মটি প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে চলছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপনের সময় আবার ভারতবর্ষের মানচিত্রে একতা এবং সাম্রাজ্য সংগঠনের সুচারু ব্যবস্থা হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তিম যুগ থেকেই আমরা উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় শক্তিসমূহের উদ্ভব দেখতে পাই। শুঙ্গ বংশীয়েরা অল্প দিনের জন্য উত্তর ভারতের কিছু অংশকে রাজনৈতিক একতাসূত্রে বাঁধতে সফল হয়েছিলেন।

যেভাবে মগধের এক রাজবংশ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অব্যবস্থার দূরীকরণ করেছিলেন এবারেও মগধের আর এক রাজবংশ তাই করলেন। এবারেও সেইভাবেই মগধ এবং তার সমীপবর্তীক্ষেত্র থেকে এক নূতন শক্তির উদয় হল, যে শক্তি মৌর্যদের পরে দ্বিতীয়বার স্বদেশী শাসনে দেশের বিস্তৃত

ভূভাগকে রাজনৈতিক ঐক্যদান করল। এই শক্তিই হ'ল ভারতীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশ।

গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিল সমুদ্রগুপ্তের। আমরা তাঁকে কয়েকটি বিভিন্ন অর্থে গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে দেখতে পাই। গুপ্তযুগের মহত্তম সাফল্য তাঁরই সাধনা দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। রাজনীতি এবং পরাক্রমের সংমিশ্রণে সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধনে, বিদেশীর শাসন হতে স্বদেশের মুক্তি বিধানে, সুসংগঠিত শাসনের দ্বারা দেশে শান্তি এবং সুব্যবস্থা স্থাপনে এবং নিজের চরিত্রে যোদ্ধ-জনোচিত শারীরিক শৌর্য ও শক্তির সঙ্গে মানসিক গুণ এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের সুন্দর সমন্বয় প্রদর্শণে তিনি গুপ্ত বংশের সম্রাটদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সমুদ্রগুপ্ত

পটভূমিকা

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সভা বসেছে। উপলক্ষের বিশেষ গুরুত্বের জন্য সভার পরিবেশ উত্তেজনাপূর্ণ। সভায় গুপ্তবংশজাত অনেক রাজকুমার উপস্থিত আছেন। সভাসদরাও চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত। এর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত নিজের পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে নিজের সত্যসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ভালো করে দেখে বললেন, "তুমি যোগ্য। তুমি সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করো।" চন্দ্রগুপ্তের রোমাঞ্চ হল, স্নেহবিহ্বলতায় তাঁর চোখ জলে ভরে গেল। চন্দ্রগুপ্তের কথা শুনে সভাসদরা প্রসন্ন হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ওদিকে বংশের অন্যান্য রাজকুমারেরা এই ভাগ্যবান রাজকুমারের দিকে ম্লানমুখে চেয়ে রইলেন।

সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ (এলাহাবাদ) প্রশস্তিতে এই নাটকীয় পরিস্থিতির বিশদ চিত্র পাওয়া যায়। কেবল গুপ্তবংশের ইতিহাসে নয়, সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই শিলা-লিপির বিশিষ্ট স্থান আছে। এই লিপিতে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের যে রেখাচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, সেটি খুবই স্পষ্ট, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য এই শিলালিপিকে অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। এই প্রশস্তি রচনা করেছেন হরিষেণ। হরিষেণ সান্ধিবিগ্রহিক কুমারামাত্য এবং মহাদণ্ডনায়কের পদে আসীন ছিলেন। তিলভট্ট নামক একজন মহাদণ্ডনায়ক ঐ লিপিটি অঙ্কিত করেছিলেন। রাজ্যের দু'জন উচ্চ পদাধিকারী এই লিপিটির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় এটির প্রামাণিকতা আরও অধিক। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এই প্রশস্তির রচনাকাল

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরবর্তীকাল বলে নির্ণয় করেন কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল কোন প্রমাণ নেই। শিলালিপিটির রচনা সমুদ্রগুপ্তের জীবিতকালেরই শেষ দিকে এবং তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে হয়েছিল। মধ্য ভারতের সাগরজেলায় 'এরণ' নামক স্থানে সমুদ্রগুপ্তের দ্বিতীয় শিলালিপি পাওয়া গেছে। এগুলি ছাড়া গয়ায় এবং নালন্দায় সমুদ্রগুপ্তের দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, কিন্তু ঐগুলির অশুদ্ধ ভাষা, অন্যান্য ত্রুটি, এবং অক্ষরানু-যায়ী কাল নিরূপণের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা ঐগুলিকে সমুদ্রগুপ্তের শাসন কালের প্রামাণিক লিপি বলে মানতে রাজি নন। এই লিপিগুলি ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা প্রবর্তিত দু'রকম মুদ্রা থেকেও তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, গুণাবলী এবং রুচি বোঝবার পক্ষে ঐ মুদ্রাগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। মুদ্রাগুলিতে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিন্যস্ত তাঁর প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

এই সকল প্রমাণ, সেই সঙ্গে আরও কিছু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদানের সাহায্যে আমরা সমুদ্রগুপ্তের জীবন এবং কৃতিত্বের একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারি। এই বইখানিতে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।

প্রবন্ধের আরম্ভতেই প্রয়াগ প্রশস্তি থেকে একটি সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের কোনো কোনো ঘটনা এবং কোনো কোনো উপলক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। ঐ রকম ঘটনাগুলি ইতিহাসের গতি এবং ধারার স্বরূপ নির্ধারণ করে। এই রকম কয়েকটি বাছাই করা ঘটনার মধ্যে প্রয়াগ প্রশস্তিতে উল্লিখিত দৃশ্যটিকেও ধরা যেতে পারে। যদি সেদিন ঐ উপলক্ষ্যে সমুদ্রগুপ্তকে ভাবী শাসক ব'লে ঘোষণা করা না হ'ত, তবে সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসের রূপ অন্যরকম হত। ইতিহাস শিক্ষার্থীর কাজ তো শুধু অতীতে

যা ঘটেছে—তাই নিয়ে ; যদি এই রকম হ'ত—তবে তার ফল কি দাঁড়াত—এ বিতর্কের মধ্যে যাওয়া নয়। তবে এও সহজেই কল্পনা করা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ না করলে গুপ্ত বংশের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক ঐক্য ও সুব্যবস্থা, এবং তার পটভূমিকায় যে সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়েছিল তা সম্ভব হত না।

কিন্তু এই দৃশ্যের প্রকৃত গুরুত্ব জানতে হ'লে গুপ্তবংশে সমুদ্রগুপ্তের স্থান কি ছিল, এবং সেদিন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত আর তাঁর সভাসদদের সামনে কি রকম সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল— তা আমাদের বোঝা দরকার।

প্রয়াগ প্রশস্তিতেই সমুদ্রগুপ্তকে মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ গুপ্তের পৌত্র, এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের ও তাঁর লিচ্ছবি বংশীয়া প্রধানা মহিষী কুমার দেবীর গর্ভজাত পুত্র বলা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্র গুপ্তের শিরায় গুপ্ত এবং লিচ্ছবি বংশের সংমিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের সম্যক্ স্বরূপ বুঝতে হলে তাঁর মাতৃকুল এবং পিতৃকুল দু'পক্ষেরই ইতিহাস জানা দরকার।

গুপ্তবংশীয়েরা কোন্ বর্ণের লোক ছিলেন, এ প্রশ্নের প্রামাণিক উত্তর দেওয়া আজও কঠিন। বিভিন্ন মতের সমর্থনে বিভিন্ন বিতর্ক উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু বিরোধী পক্ষ সেইসব মতবাদের খণ্ডনও করেছেন।

যদিও এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না, তবুও সম্ভবত গুপ্তেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন : তবে নামের অন্তে ব্যবহৃত গুপ্ত উপাধির ভিত্তিতে তাঁদের বৈশ্যই বলতে হবে।

গুপ্তদের বংশতালিকায় মহারাজ শ্রীগুপ্তের নাম প্রথমেই আসে। এরূপ সন্দেহও করা হয়েছে যে, গুপ্ত নামটাই কাল্পনিক, ঐ নামের কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। যেহেতু

ঐ দেশের রাজাদের নামের শেষে গুপ্ত পদাব আছে, এইজন্য পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে গুপ্ত নামধারী আদিপুরুষের কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঠিক বলে মনে হয় না।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত ছিল, শুধু গুপ্ত নয়। তাঁদের বিচারে 'গুপ্ত' নামটি ক্ষীণ এবং অদ্ভুত ধরনের। কিন্তু এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। কারণ এধরণের নাম আমরা অনেক প্রাচীন লিপিতে পাই; উদাহরণার্থে দত্ত, রক্ষিত বলা যেতে পারে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের তুলনায় গুপ্ত এবং ঘটোৎকচের সময়-কার গুপ্ত বংশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য ছিল না। গুপ্তবংশের শিলালেখগুলিতে প্রথম দু'জন রাজার জন্য মহারাজ এবং চন্দ্রগুপ্ত ও পরবর্তী শাসকদের জন্য মহারাজাধিরাজ পদবী ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রভেদ অকারণে করা হয়নি, জেনে বুঝেই করা হয়েছিল। গুপ্তের সময়ে তাঁর বংশ রাজবংশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর অধিকারের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। উপাধির পার্থক্যকে ভিত্তি করে এও বলা হয় যে, গুপ্ত এবং ঘটোৎকচ স্বাধীন রাজা ছিলেন না, গুপ্ত বংশের স্বাধীন সত্তা চন্দ্রগুপ্তের সময়েই স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু গুপ্ত এবং ঘটোৎকচকে সামন্ত রাজা বলে মেনে নিলে প্রশ্ন উঠবে—তাঁরা কাঁর অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন? সে যুগে উত্তর ভারতের পূর্বভাগে এমন কোনো শক্তি ছিল না, যার প্রভাব এত বেশী ছিল যে তার অধীনে ঐ রকম সামন্ত রাজ্য থাকতে পারত। মহারাজ এবং মহা-রাজাধিরাজের মধ্যে তুলনাত্মক দৃষ্টিতে মহারাজের জন্য নিম্নতর রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মহারাজ নিজেই অন্যের সামন্ত অবস্থার দ্যোতক—একথা মনে করা ভুল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি রাজবংশের এবং

কয়েকজন রাজার নাম উদাহরণ স্বরূপ গণনা করা যায় যাঁরা স্বাধীন ছিলেন, এবং মহারাজ উপাধি ব্যবহার করতেন।

গুপ্তদের সম্বন্ধে চীনদেশীয় পর্যটক ইৎসিং একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ৬৭১ থেকে ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি নিজের যাত্রা বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পাঁচশ' বছর আগে মহারাজ চেলিকিতো একটি চীনা মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং তার ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করেছিলেন। ইৎসিংএর বর্ণিত মহারাজ চেলিকিতোকে গুপ্তবংশের মহারাজ শ্রীগুপ্তই বলা চলে। নামসাম্য ছাড়াও ছু'জনের উপাধি এক, ছু'জনের কার্য্যক্ষেত্র এবং সময়ও একই দাঁড়াচ্ছে। যদি এই বিবরণকে গুপ্তবংশের প্রথম রাজা গুপ্তের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় তবে আমরা তাঁর ঐতিহাসিকতার সঙ্গে আরও কিছু কথা জানতে পারছি। চীনদেশীয় বৌদ্ধ যাত্রীদের জন্য মন্দির নির্মাণ আর চব্বিশটি গ্রাম দান ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর উদারতার পরিচায়ক। এই বিবরণ সত্য হলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে গুপ্তের রাজ্য কোনো রকমেই ছোট রাজ্য ছিল না। চব্বিশখানি গ্রাম দান তাঁর শক্তি এবং প্রভাবের পরিচায়ক।

ইৎসিং-এর বিবরণের চেলিকিতো আর গুপ্তবংশের প্রথম রাজা যে একই ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, চেলিকিতোর সময় ১৭২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, ওদিকে মহারাজ গুপ্তের সময় ২৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ছিল। এইভাবে ছুজনের মধ্যে প্রায় একশ' বছর সময়ের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু সময়ের এই পার্থক্য নিয়ে বিশেষ বাধা হচ্ছে না। ইৎসিং যখন চেলিকিতোকে নিজ সময়ের পাঁচশ' বছর পূর্ববর্তী বলে-ছিলেন তখন তিনি সময়ের কোনো সঠিক সংখ্যা দেননি, মোটামুটি রীতিতে চেলিকিতোর সময়ের একটা আভাস

দিয়েছেন মাত্র। আবার এও ঠিক স্বয়ং ইৎসিংএর বর্ণনানুযায়ী তাঁর বিবরণ মৌখিক কিংবদন্তীর ভিত্তিতে তৈরি, যা বৃদ্ধদের স্মৃতিতে রক্ষিত ছিল। এই রকম লোক পরম্পরা প্রাপ্ত তারিখকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে আশা করা ঠিক হবে না। এইজন্য সম্প্রতি আমরা চেলিকিতোকে শ্রীগুপ্ত বলে মানতে বিশেষ কোনো বাধা দেখছি না।

এই বিবরণ থেকে গুপ্তদের মূল রাজ্য অথবা আদি নিবাস সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ইৎসিংএর বর্ণনানুযায়ী গুপ্তের দ্বারা নির্মিত চীনা মন্দির ও মৃগশিখাবন নামক দ্বিতীয় মন্দির কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। মৃগশিখাবন গঙ্গার ধারে নালন্দা থেকে চল্লিশ যোজন পূর্বে অবস্থিত ছিল। প্রথমদিকে কয়েকজন পণ্ডিত মৃগশিখাবনকে বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে অবস্থিত বলেছেন, কিন্তু যদি নালন্দা থেকে সম্পূর্ণ সোজা গিয়ে গঙ্গার ধারের দূরত্ব পরীক্ষা করা যায় তবে মৃগশিখাবন বাংলাদেশের মালদহ জেলায় পড়ে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বাংলা দেশের কিছু অংশ প্রথম থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত মৃগ-শিখাবনকে নালন্দার চল্লিশ যোজন পশ্চিমে রেখে প্রারম্ভিক গুপ্তরাজ্যকে উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে ধরেছেন। কিন্তু ইৎসিং-এর মূল বিবরণে মৃগশিখাবনকে নালন্দার পূর্বদিকে বলা হয়েছে, তদনুসারে স্থানটিকে নালন্দার পশ্চিমে অনুমান করা উচিত নয়।

গুপ্তের পর তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ সিংহাসন লাভ করেন। গুপ্তবংশের লিপিগুলিতে গুপ্তের মতো ঘটোৎকচের জন্যও মহারাজ উপাধির প্রয়োগ হয়েছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ঐ বংশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু যদিও গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠার গোড়া-

পত্তন গুপ্ত করেছিলেন, তবু ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঘটোৎকচেরই স্থান সর্বপ্রথম। সম্ভবতঃ এইজন্য সেকালেও কিছু লোকের ধারণা ছিল যে, গুপ্ত রাজবংশ স্থাপনের সম্মান ঘটোৎকচেরই প্রাপ্য। মধ্য প্রদেশের রেওয়ার কাছে সুপিয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপিতে বংশের নাম গুপ্তের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে ঘটোৎ-কচের সঙ্গে করা হয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার পুণা এবং রিঠপুরের দানপত্রেও ঘটোৎকচকে আদি রাজা বলা হয়েছে, এবং তাঁর থেকেই বংশতালিকার আরম্ভ ধরা হয়েছে। কিন্তু ঘটোৎকচ বংশের মর্যাদা এবং প্রভাব বৃদ্ধির জন্য কি কাজ করেছিলেন, ও থেকে তা স্থির করা যায় না। কোনো বিস্তৃত তর্ক বিতর্কে না গিয়ে আমরা এখানে বলতে চাই যে, ঘটোৎকচের স্বর্ণমুদ্রা এবং বৈশালীতে প্রাপ্ত ঘটোৎকচ গুপ্তের নামের শিলমোহরকে ঘটোৎকচের সঙ্গে সম্পর্কিত করা চলে না, কারণ এই দুটিই পরবর্তী কালের তৈরী।

গুপ্তবংশের লিপিগুলিতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জন্যই সর্বপ্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধির ব্যবহার হয়েছে। তাঁর পূর্বেকার রাজাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'মহারাজ' উপাধির তুলনায় এই নূতন উপাধি থেকে বোঝা যায় যে, বংশের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুত্বের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছিল। যদি আগেকার গুপ্ত নৃপতিরা সামন্ত রাজা রূপে থেকে থাকেন, তবে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় গুপ্ত বংশের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদি তাঁরা প্রথম থেকেই স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করে থাকেন তবে ঐ সময়ে তাঁদের সাম্রাজ্যের সীমার এবং রাজনৈতিক শক্তির বিশেষ রকম শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই গুপ্ত সংবৎ স্থাপনের জন্য সম্মান দেওয়া হয়। নূতন সংবৎ প্রবর্তন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের প্রতাপ এবং পরাক্রমের যথেষ্ট প্রমাণ।

চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে নিজের অধিকার এবং প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনি কোন্ কোন্ নূতন প্রদেশ জয় করেছিলেন—এই সব বিষয়ে বিশেষ কিছুই আমাদের জানা নেই। কিন্তু লিচ্ছবি রাজ্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য মিলিত হওয়াই যে গুপ্ত বংশের শক্তি বৃদ্ধির মূল কারণ—এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। দুই রাজ্যের শক্তি সম্মিলিত হয়েছিল বলেই গুপ্তবংশ নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত তথা সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিল। লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীর সঙ্গে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়েছিল। সমুদ্র-গুপ্ত ছিলেন কুমার দেবীর পুত্র। গুপ্তবংশের লিপিগুলিতে সমুদ্রগুপ্তকে সর্বদা লিচ্ছবি-দৌহিত্র অর্থাৎ লিচ্ছবি রাজকন্যার পুত্র বলা হয়েছে। একটি বিশেষ রকমের স্বর্ণমুদ্রায় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমার দেবীর বিবাহের সবচেয়ে মনোরম প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ মুদ্রাগুলির এক দিকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমার দেবীর আকৃতি এবং নাম অঙ্কিত আছে। তাতে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত যেন কুমার দেবীকে আংটির মতো কোনো বস্তু দিচ্ছেন। মুদ্রাটির অপর পিঠে সিংহের উপর বসে আছেন এক দেবী মূর্তি আর 'লিচ্ছবয়ঃ' এই লিপিটি অঙ্কিত আছে।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ঐ মুদ্রাগুলি সমুদ্রগুপ্ত তৈরি করিয়েছিলেন। এইরূপে তিনি নিজের মা'র এবং বাবার বিয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডক্টর অল্‌টেকর এই অভিমত বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করেছেন। যখন ঐ মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের নাম পাওয়া যাচ্ছে না তখন ঐ গুলিকে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কিত বলা ঠিক হবে না। সাধারণ নিয়ম এই যে, রাজা যে মুদ্রা প্রচলন করেন, তিনি নিজের নাম সেই মুদ্রায় দিয়ে থাকেন। এই নিয়মে ঐ মুদ্রাগুলিকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা নির্মিত বলাই উচিত। এটাও মনে রাখা

প্রয়োজন যে, ভারতীয় পরম্পরাগত রীতি অনুযায়ী পুত্রের দ্বারা মাতাপিতার বিবাহদৃশ্য দেখানো উচিত বিবেচনা করা হয় না।

শুধু গুপ্তবংশের ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসেই এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলির নিজেদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। অন্য কোনো ভারতীয় রাজার দ্বারা মুদ্রায় নিজের সঙ্গে রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করার উদাহরণ পাওয়া যায় না। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি এই যে, এই মুদ্রাগুলিতে গুপ্ত বংশের নামতো পাওয়া যাচ্ছেই না—অথচ কুমার দেবীর পিতৃবংশ লিচ্ছবিদের উল্লেখ আছে। এর দ্বারা এই বোঝা যাচ্ছে যে, চন্দ্রগুপ্ত নিজের বংশের চেয়ে তাঁর রাণীর বংশকে বেশী মর্যাদা দিয়েছিলেন।

গুপ্ত বংশের দৃষ্টিতে লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে এই বিবাহ সম্বন্ধের গুরুত্ব কতখানি, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়েছে, লিচ্ছবিদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে গুপ্ত বংশের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিচ্ছবিজাতির ভূমিকা অতি গৌরবময়। তাঁরা ছিলেন এক প্রাচীন জাতি, তাঁদের রাষ্ট্র গণতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু লিচ্ছবিদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ গুপ্তদের সামাজিক সম্মান এবং গৌরবের কারণ হতে পারে না। একথা সকলেই জানেন যে, গুপ্ত সম্রাটরা ধর্মশাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পোষক ছিলেন। মনু স্মৃতিতে লিচ্ছবিদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে ধরা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন না করায় যাদের ধর্মচ্যুত মনে করা হ'ত—তারাই ব্রাত্য। স্পষ্টই বোঝা যায় লিচ্ছবিদের প্রাচীনত্বের এতটা মর্যাদা গুপ্তসম্রাটদের কাছে হওয়া সম্ভব ছিল না।

লিচ্ছবিদের সঙ্গে সম্বন্ধের গুরুত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক। এই সম্বন্ধের ফলে গুপ্তবংশের রাজনৈতিক শক্তি

বৃদ্ধি হয়েছিল। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিদের পরাজিত করেছিলেন; কিন্তু পরে তুই পক্ষে সন্ধি হয়েছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকেও মেনে নেওয়া যায় না। যদি বাস্তবিক চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিদের জয় করে থাকতেন তবে তিনি বিজিত পক্ষকে এতটা মর্যাদা কেন দিয়েছিলেন? আমরা উপরে যেমন বলেছি তদনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমার দেবীর নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকে এই তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে যে, লিচ্ছবিদের পাল্লা গুপ্তদের তুলনায় কোনো রকমেই হাল্কা ছিল না, বরং ভারীই ছিল। এই মুদ্রাগুলিতে কুমার দেবীর নাম এবং আকৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, কুমার দেবীর পদমর্যাদা শুধু চন্দ্রগুপ্তের পত্নীরূপে ছিল না, তিনি স্বয়ং রাজ্যশাসনের অধিকারিণী ছিলেন। সম্ভবতঃ কোনো পুরুষ-উত্তরাধিকারীর অভাবে তিনি লিচ্ছবি রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই বিবাহের ফলে তুটি রাজ্য মিলিত হয়েছিল। মনে হয়, এই সম্মিলিত রাজ্যে লিচ্ছবি বংশের গুরুত্ব গুপ্ত বংশের চেয়ে কোনো রকমেই কম ছিল না। মুদ্রাতে লিচ্ছবি নামা বহু বচনে থাকাতে (লিচ্ছবয়ঃ) কেউ কেউ মনে করেন, লিচ্ছবিদের রাজ্য আগের মতো গণতন্ত্র শাসিত ছিল। কিন্তু কুমার দেবীর পদমর্যাদা এবং অধিকার থেকে প্রমাণ হয় যে, সে রাজ্য রাজতন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। 'লিচ্ছবয়ঃ' শব্দের ভিত্তির বিষয়ে আমরা বলতে পারি যে, রাষ্ট্র রাজতন্ত্রাত্মক হয়ে যাওয়ার পরেও লিচ্ছবিদের মধ্যে গণতন্ত্রসূচক পরম্পরাগত ঐতিহ্য শেষ হয়ে যায় নি। এটি সহজেই অনুমান করা যায় যে লিচ্ছবিদের মনে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট গর্ব ছিল এবং ঐজন্য বোধ হয় তারা মুদ্রাতে 'লিচ্ছবয়ঃ' শব্দ অঙ্কিত করত। সম্ভবত নিজেদের ঐ রকম আত্মাভিমানের জন্যই গুপ্ত এবং লিচ্ছবিরাজ্য

মিলিত হওয়ার পরেও নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যে সচেতন এবং পরম্পরাক্রমিক লিচ্ছবিরা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা কোনো না কোনো রূপে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মুদ্রায় কুমার দেবীর প্রতিকৃতি এবং নাম লিচ্ছবিদের সেই প্রয়াসেরই ফল।

এই সময়ে লিচ্ছবিদের রাজ্য কোথায় ছিল, এবিষয় মতভেদ আছে। বলা হয়, মগধে লিচ্ছবিদের অধিকার ছিল এবং তাদের মাধ্যমেই মগধ গুপ্তরাজ্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল। কিন্তু এটা কেবল অনুমান মাত্র—মগধে যে লিচ্ছবিদের রাজ্য ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। নেপালে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিচ্ছবিদের একটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কুমার দেবী যে লিচ্ছবি রাজ্যের শাসনকর্ত্রী ছিলেন, সে রাজ্য নেপালে অবস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না ; যেহেতু সমুদ্রগুপ্তের সময়েও নেপাল গুপ্ত সাম্রাজ্যে যুক্ত হতে পারেনি। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে ঐ রাজ্যকে সীমান্তস্থিত রাজ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই বৈশালীতে (বিহারের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান বসাঢ়ে) লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। মগধের সম্রাট অজাতশত্রু লিচ্ছবিরাজ্য জয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কালেও লিচ্ছবিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগেও লিচ্ছবিদের রাজ্য বৈশালীতেই ছিল।

মনে হয়, গুপ্ত এবং লিচ্ছবিদের রাজ্যের সীমারেখা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল, এইজন্য বিবাহের পরে দু'টি রাজ্যের মিলনে যে সম্মিলিত শক্তির উদয় হ'ল, সেই শক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এই মিলনের সবচেয়ে অমূল্য রত্ন ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তার কতদূর পর্যন্ত ছিল? সমুদ্রগুপ্ত নিজের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন্

রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন—এটা নির্ণয় করে নিলে আমরা আরও ভালোভাবে সমুদ্রগুপ্তের কীর্তির মূল্য নিরূপণ করতে পারি। পুরাণগুলিতে একটি শ্লোক আছে, যার অর্থ, গুপ্তবংশে উৎপন্ন রাজা গঙ্গার তীরবর্তী সাকেত (অযোধ্যা) এবং মগধ (দক্ষিণ বিহার) পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ভোগ করবেন। পণ্ডিতদের মতে এই শ্লোকে বর্ণিত রাজ্য প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়কার রাজ্য। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে বিহারের অধিকাংশ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সম্ভবতঃ উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলাদেশের কিছু অংশও যুক্ত ছিল।

সিংহাসন প্রাপ্তি

সমুদ্রগুপ্তের জীবিতকালের ঘটনাগুলিকে কালানুক্রমিক-ভাবে সাজানো সম্ভব নয়। তাঁর প্রয়াগপ্রশস্তি এবং এরণ-এর শিলালিপিতে কোনো তারিখ পাওয়া যায় না। তাঁর নালন্দা এবং গয়ার দানপত্র যথাক্রমে তাঁর রাজ্যকালের পঞ্চম এবং নবম বর্ষে লেখা হয়েছিল। কিন্তু ঐ দানপত্রগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, অতএব এর কোন্ কোন্ তত্ত্ব ইতিহাস রচনার জন্য গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সমুদ্রগুপ্তের আগে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, ঘটোৎকচ অথবা গুপ্তেরও রাজত্বকালের কোনো লিপি না পাওয়ায় সমুদ্রগুপ্তের জীবনচরিত সাল তারিখ দিয়ে বাঁধা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের সমাপ্তির সময় নির্ধারণ করা কঠিন নয়। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরালিপি হতে জানা যায় যে, ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের পঞ্চম বর্ষ ছিল, তদনুসারে তাঁর রাজ্যকাল আরম্ভ হয়েছিল ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু নিশ্চয় এর আগে হয়েছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বড়ো ভাই রামগুপ্তের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করা যায় (যা করা উচিতও বটে) তাহলে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল বলা যেতে পারে।

কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের সময় নির্দ্ধারণে অনেক রকম আনুমানিক মতবাদ আছে। এই সমস্যার সমাধান—গুপ্ত-সংবতের আরম্ভ কে কোন্ বিশেষ উপলক্ষ্যে করেছিলেন—সেই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। গুপ্তসংবতের প্রথম বর্ষকে ৩১৯-৩২০ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হয়। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্তই

ঐ সংবৎ প্রবর্তিত করেন, আর তদনুসারে তিনি সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের আরম্ভ ৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে বলে ধরেছেন।

কিন্তু অন্য যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার সারাংশ এই পাওয়া যাচ্ছে যে, সমুদ্রগুপ্তের জন্ম অনুমানিক ৩২০-২১ খ্রীষ্টাব্দ। যদি আমরা ধরে নিই, পিতার দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সময় সমুদ্রগুপ্তের বয়স কুড়ি অথবা পঁচিশ বৎসর ছিল, তা'হলে ঐ ঘটনার সময় ৩৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ধরা যেতে পারে। অন্য মত অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহলে মেনে নিতে হয় যে, ৩৪০-৪৫ অথবা ৩৫০-এর মধ্যে কোনো-একটির পক্ষে বিশেষ সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই, কেবল অনুমান অথবা গণনার সুবিধাই আমাদের একমাত্র সহায়ক। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের তারিখ ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করবার কোনো প্রয়োজন আমরা দেখছি না, বরং ৩৪০-৪৫এ ধরলে আমাদের কিছু সুবিধাই হয় দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা উত্তরাধিকারী নির্বাচনের চিন্তা এবং গোড়াতেই বিরোধীদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধ থেকেও এই বোঝা যায় যে সে সময়ে তাঁর বয়স বেশী ছিল না। সেই সঙ্গে প্রথমকার তারিখটি স্বীকার করে নিলে আমরা সমুদ্রগুপ্তের কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনের অনেক সংঘর্ষ ও কৃতিত্বের জন্য আরও বেশী সময় দিতে পারি।

সংক্ষেপে আমরা চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমারদেবীর বিবাহ ৩১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে, সমুদ্রগুপ্তের জন্ম ৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে, সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ ৩৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু ৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ধরতে পারি। এখানে আমরা আবার বলে রাখতে চাই যে, এই তারিখগুলি সবই আনুমানিক, সুতরাং সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। কিন্তু প্রাপ্ত লিপি ইত্যাদি পরীক্ষা করে এই তারিখগুলিই সবচেয়ে বেশী সম্ভব বলে মনে হয়। এই

সালগুলি মোটামুটিভাবে ধরা হয়েছে, একেবারে ঠিক সময়ের কথা বলা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।

সমুদ্রগুপ্ত নিজের মাতাপিতার গৌরবময় ঐতিহ্য এবং সংস্কার লাভ করেছিলেন। একদিকে তাঁর মধ্যে তাঁর পিতার পরাক্রম এবং রাজনীতিজ্ঞান ও অন্যদিকে মাতৃপক্ষ থেকে তিনি লিচ্ছবিদের প্রাচীন সম্মানিত ঐতিহ্য পেয়েছিলেন। সেইজন্য স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিত্বের গৌরবময় বিকাশ হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হয়েছিল, যাতে তাঁর সহজাত গুণগুলির উপযুক্ত বিকাশ হয়, ছাত্রাবস্থা থেকে অভ্যাসের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের সোনা অগ্নিতাপে পূর্ণপ্রকাশে ঝলমল করে উঠেছিল। সমুদ্রগুপ্তের প্রথম জীবন এবং তাঁর শিক্ষার উল্লেখ কোনো পুরাতন প্রমাণেই আমরা পাই না, কিন্তু প্রয়াগ প্রশস্তি এবং অন্যান্য প্রমাণ বর্ণনায় তাঁর কীর্তিকলাপ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা কল্পনা ক'রে নেওয়া সম্ভবপর হয়। কোনো ক্ষত্রিয় রাজকুমারের যেরূপ শিক্ষা হওয়া দরকার তাঁর শিক্ষা তদনুরূপ হয়েছিল। তিনি সবরকম অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগে নিপুণ হয়েছিলেন। তাঁকে সৈন্য চালনা এবং রাজনীতি শিক্ষাও সম্ভবত দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজের মৃগয়া প্রীতি উপযুক্তরূপে বাড়িয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষা কেবল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি বিধিপূর্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সাহিত্যে তাঁর রুচি এবং কৃতিত্ব দেখে ধারণা হয়—তিনি নিজের পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। সাহিত্য এবং পরম্পরাগত শাস্ত্রসমূহ ছাড়াও সমুদ্রগুপ্ত ললিতকলাগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং নৈপুণ্যলাভ করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের জীবনের ঘটনাগুলি ঠিক ক্রমানুসারে সাজাতে

অসমর্থ হওয়ায় তাঁর বিজয় এবং রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ দেওয়ার পূর্বে আমরা তাঁর পারিবারিক জীবনের উল্লেখ করতে চাই। সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তশাসকদের লিপি থেকেও জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের পত্নী এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মা'র নাম ছিল দত্তদেবী। দত্তদেবী সম্ভবত তাঁর প্রথমা এবং প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর সম্ভবত দত্তদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। অনুমান এইভাবে করা হয় যে, সমুদ্রগুপ্তের 'এরণ' লিপিতে তাঁর কুলবধূরূপে সম্ভবত দত্তদেবীরই উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক পুত্রপৌত্রবতী বলা হয়েছে। দত্তদেবী ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের হয়তো আরও কয়েক-জন রাণী ছিলেন। প্রাচীনকালে বিশেষ করে রাজাদের মধ্যে বহু বিবাহ ছিল সাধারণ নিয়ম। প্রয়াগ প্রশস্তি থেকেও জানা যায় যে, অধীনতা স্বীকারকারী কয়েকজন রাজা মিত্রতার সম্বন্ধ দৃঢ় করবার জন্য সমুদ্রগুপ্তকে কন্যা সমর্পণ করেছিলেন। যাইহোক সমুদ্রগুপ্তের জীবন ছিল সমৃদ্ধ এবং সুখময়। এরণের প্রশস্তিতে তার সুখময় পরিবারের চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁর প্রাসদে হাতী, ঘোড়া, রত্ন এবং ধনধান্যাদি বৈভবে পরি-পূর্ণ ছিল। পরিবারে ছিল বহু পুত্রপৌত্র। তাঁর প্রসন্নচিত্তা কুললক্ষ্মী ধর্মপরায়ণা ছিলেন। রাজনৈতিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে পারিবারিক সুখ ও শান্তি যে অল্পসংখ্যক রাজার ভাগ্যে জুটেছিল, তাদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের নাম গণনা করা যায়। সিংহাসনের জন্য যদিও তাঁকে প্রথমদিকে নিজের বংশের অন্য কয়েকজন রাজকুমারের সঙ্গে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তবুও পরবর্তীকালে তার পারিবারিক জীবন শান্তিময় ছিল। কোথাও কোনোরূপ কলহের জন্য তাকে দুঃখ পেতে হয় নি। পারিবারিক শান্তি এবং সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলেই তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে দিগ্বিজয় যাত্রা করেন এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধির

চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন। পুত্র এবং পৌত্রদের মধ্যেও অধিকার লাভের জন্য কোনো সংঘর্ষ তার জীবিতকালে হয় নি।

সমুদ্রগুপ্তের জীবনের যে প্রথম ঘটনার বিবরণ আমরা পাই তা প্রয়াগ প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয়েছে, প্রবন্ধের প্রথমেই সে কথা বলা হয়েছে। গুপ্ত বংশের ইতিহাসের বিচার করলে সমুদ্রগুপ্তের সাফল্যের জন্য প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সমুদ্রগুপ্তকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করতে হয়। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর এই ঘোষণা সভাসদ্‌দের এবং বংশের অন্যান্য রাজকুমারের উপস্থিতিতে করেছিলেন। এই রকম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবার তাঁর কি দরকার ছিল? মনে হয় রাজবংশের অন্য কয়েক ব্যক্তি সিংহাসনের জন্য লালায়িত ছিলেন এবং তাঁদের পদ নিয়ে রাজ সভায় কয়েকটি দল ছিল। এই রকম অনিশ্চিত অবস্থায় অব্যবস্থা এবং অশান্তির সম্ভাবনা ছিল। রাজপরিবার সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভবিষ্যতে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ হবার আশঙ্কাও ছিল। চন্দ্রগুপ্ত সর্বজন সমক্ষে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে অপরদের অনুমান বা উচ্চাকাঙ্খাকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

প্রয়াগ প্রশস্তির উল্লেখ থেকে এও বোঝা যায় যে সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। তিনি যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র হতেন তাহলে এই রকম অনিশ্চিত অবস্থার সম্ভাবনাও থাকত না। সমুদ্রগুপ্তকে যে চন্দ্রগুপ্ত বলেছিলেন, "তুমি যোগ্য" তা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জ্যেষ্ঠত্বের জন্য সিংহাসনের উপর দাবী সমুদ্রগুপ্তের ছিল না, তাঁর পক্ষে কেবল যোগ্যতার দাবী ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের এই নির্বাচনে যেটুকু বিলম্ব হয়েছিল তা সম্ভবত এই জন্য যে, সমুদ্রগুপ্তের বিপক্ষের উচিত দাবি

ছিল ; এও হতে পারে যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে সব লোক ক্রমবর্ধমান বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার কঠোরতার সমর্থক ছিলেন, তাঁরা ব্রাত্য লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমারদেবীর সন্তানকে সিংহাসনের অধিকার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। চন্দ্রগুপ্ত যে সমুদ্রগুপ্তকে "তুমি আর্য" বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, তাতে এই প্রশ্নের উপর তাঁর সিদ্ধান্ত সূচিত করছে। সমুদ্রগুপ্ত শিক্ষার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করেছিলেন এবং নিজের গুণের যোগ্য পরিচয় দিয়েছিলেন, সেইজন্য চন্দ্রগুপ্ত বুঝেছিলেন যে, ভবিষ্যতে সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে সমুদ্রগুপ্তই হবেন সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। গুপ্ত সাম্রাজ্যে লিচ্ছবি সাম্রাজ্যের গুরুত্ব এবং লিচ্ছবিদের নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছার সম্বন্ধে বিবেচনা করে সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত স্থির করেছিলেন যে, একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের স্থাপনের জন্য লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমার দেবীর সন্তানেরই সিংহাসনে অরোহণ আবশ্যক। এর ফলে শক্তিশালী লিচ্ছবিরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের রক্ষা এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করবে।

চন্দ্রগুপ্ত এই উপলক্ষ্যে বাস্তবিক কি করেছিলেন ? তিনি কি কেবল নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন অথবা অনুষ্ঠানিকভাবে সমুদ্রগুপ্তের অনুকূলে নিজে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন ? প্রয়াগ প্রশস্তির শ্লোকের দুরকম অর্থই হতে পারে। কিন্তু যদি শ্লোকটির কথার শব্দার্থ করা যায় তবে ঐ থেকে এই সূচিত হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে শাসনদণ্ড অর্পণ করেছিলেন। শ্লোকটিতে যে রকম পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে তা ঐ রকম গুরুতর এবং আনুষ্ঠানিক উপলক্ষেরই অনুকূল।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা দ্বারা ভাগ্যের বিধান তো বদলানো সম্ভব ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের রাজকুমারদের মধ্যে

পারস্পরিক বিবাদ শান্ত করাবার জন্যই সমুদ্রগুপ্তের হাতে শাসনরজ্জু দিয়েছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই সেই অসন্তুষ্ট রাজকুমারেরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তকে অধিকারচ্যুত করে সিংহাসন লাভ করতে চেয়েছিল। নিশ্চিন্তরূপে বলা কঠিন, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ঘটেছিল—ফলে রাজ পরিবারের অসন্তুষ্ট অংশের পক্ষে নূতন রাজাকে সরিয়ে দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

প্রশস্তি লেখক উল্লেখ করেছেন যে সমুদ্রগুপ্তকে শাসক বলে ঘোষিত করা উপলক্ষ্যে অন্য রাজকুমারদের মুখ ম্লান হয়েছিল, সেটা অহেতুক নয়। ওতে ভবিষ্যতে যে দুঃখজনক বিবাদ ঘটবে তারই পূর্বাভাস ছিল। প্রয়াগ প্রশস্তি শিলালেখে পরবর্তী অংশ এত ভাঙাচোরা যে প্রথম দিকের ঘটনাগুলির বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে কয়টি শব্দ বা বাক্যাংশ বেঁচে গেছে—তা থেকে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্তকে বিরোধীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তিনি একাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, কয়েকজন তাঁর অতি মানুষিক ক্রিয়া কলাপ দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কয়েকজন বা তাঁর পরাক্রম দেখে বা তাঁর নিকট পরাজিত হয়ে নতিস্বীকার করেছিল; যারা নিত্য উপদ্রব করত, তারা তাঁর ভুজবলে পরাজিত হয়ে নিজেদের গর্ব ত্যাগ করে গভীর সন্তোষ ও স্নেহ পূর্ণ হৃদয়ে অনুতাপ প্রদর্শন করেছিল। এটি স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষরা সাধারণ ব্যক্তি ছিল না, এবং তিনি নির্বিচারে পদদলিত করে তাদের শেষ করে দিতে পারতেন না। বিরোধীদের গর্ব, সন্তোষ, স্নেহ ও অনুতাপের ভাবের উল্লেখে জানা যায় যে, ঐ বিরোধীরা তাঁর পরিবারেরই লোক ছিলেন।

এদের শত্রুতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। সমুদ্রগুপ্ত নিজ শৌর্য এবং পরাক্রম দ্বারা তাঁদের উপদ্রব দমন করেছিলেন।

প্রয়াগ প্রশস্তির অবশিষ্ট অংশে বিরোধীদের নাম অথবা সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধের স্পষ্ট নির্দেশ নেই। কিন্তু অন্য প্রমাণের সাহায্যে ঐ ঘটনাগুলির পুনরুদ্ধার এই ভাবে করা যায়। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের অন্য রাজকুমারেরা সমুদ্রগুপ্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কাচ তাঁদের নেতৃত্ব করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথমদিকে এই বিরোধীরা সফলও হয়েছিলেন এবং সিংহাসনে কাচের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। তিনি কয়েক বছর রাজ্যশাসনও করেছিলেন। শাসকরূপে তিনি নিজের নামে স্বর্ণমুদ্রাও প্রচলিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য দীর্ঘ স্থায়ী হয় নি। শীঘ্রই সমুদ্রগুপ্ত নিজের শক্তি পুনঃ সংগঠিত করে বিরোধীদের পরাজিত করেন। এ কাজটি তাঁর পক্ষে অসাধারণ ছিল যার জন্য তাঁর বিরোধীরাও আশ্চর্যান্বিত হন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত ঐ বিরোধীদের সঙ্গে উদারতাপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাঁদের দণ্ড না দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁদের স্নেহ ও সৌহার্দ্য জয় করেছিলেন।

কাচের নাম আমরা কেবল তাঁর মুদ্রা থেকে জানতে পারি। ঐ মুদ্রাগুলির উপর দিকে ভারতীয় বেশে বাঁ দিকে দণ্ডায়মান রাজা বাঁ হাতে চক্রধ্বজ ধরে আছেন, আর ডান হাত দিয়ে বেদীর উপর আহুতি দিচ্ছেন। তাঁর বাঁ হাতের নীচে 'কাচ' আর বৃত্তের মধ্যে "কাচোগামবজিত্য দিবং কর্মভিরুত্তমৈঃ জয়তি" (কাচ পৃথিবী জয় করে নিজের উত্তম কর্ম দ্বারা স্বর্গ জয় করেছেন) লেখা আছে এবং মুদ্রার পিছন দিকে প্রভামণ্ডলযুক্তা দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীর আকৃতি আছে। তাঁর ডান হাতে ফুল

অথবা পাশ আছে আর বাঁ হাতে কার্নুকোপিয়া এবং মুদ্রায় লিখিত আছে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' যার অর্থ সকল রাজার উচ্ছেদকারী।

কাচের সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। কাচের মুদ্রা সর্বদাই গুপ্তবংশের মুদ্রার সঙ্গে পাওয়া যায় এবং অঙ্কনভঙ্গী প্রভৃতিতে গুপ্তমুদ্রার পরম্পরার অনুরূপ বলে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, কাচ গুপ্তবংশের কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর মুদ্রাগুলির ওজনকে ভিত্তি করে আমরা কাচকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আগের কোনো সময়ের ধরতে পারি। কয়েকজন মুদ্রাশাস্ত্রীর মতানুসারে কাচকে গুপ্তবংশের ইতিহাসের গোড়াতেও ধরা যেতে পারে। তবে ঐ মুদ্রাগুলি ঘটোৎকচের হতে পারে না, কারণ ঘটোৎকচ নামকে কোনোপ্রকারেই 'কাচ'এ পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়। কাচের মুদ্রার প্রস্তুত কর্তাদের বা লেখকদের অসাবধানতার জন্য নামের পরিবর্তন হওয়া অথবা ঐগুলিকে রামগুপ্তের মুদ্রা বলে মনে করা উচিত হবে না। সম্প্রতি দু'টি মত বেশী প্রচলিত। একটি হল, কাচ সমুদ্রগুপ্তেরই গোড়ার দিকের নাম, আসমুদ্র পৃথিবী জয় করে সমুদ্রগুপ্ত নাম ধারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, কাচ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কাচ যে বাস্তবিক সমুদ্রগুপ্তেরই নাম ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। কাচকে এবং সমুদ্রগুপ্তকে দুজন ভিন্ন ব্যক্তি বলে স্বীকার করাই ঠিক। গুপ্তবংশের মুদ্রায় রাজাদের একটিমাত্র নাম ব্যবহৃত হয়, যা বাহুর নীচে লেখা থাকে। কাচ এবং সমুদ্রগুপ্ত দুজনেরই বাহুর নীচে লেখা ঐ রকম নাম পাওয়া যায় যা থেকে দুটিকে পৃথক ব্যক্তির নাম বলে ধরা উচিত। যদি সত্যিই কাচ সমুদ্রগুপ্তের নাম হয়, তবে কেন কাচের নাম কেবল চক্রধ্বজযুক্ত মুদ্রায় পাওয়া যাচ্ছে, সমুদ্রগুপ্তের অন্য প্রকার মুদ্রায় ঐ নাম কেন পাওয়া যাচ্ছে না? এইরূপে যদি

কাচ ও সমুদ্রগুপ্তকে একই ব্যক্তি বলে মেনে নেওয়া যায় তবে চক্রধ্বজ কেন কেবল 'কাচ' নামযুক্ত মুদ্রাতেই পাওয়া যাচ্ছে, সমুদ্রগুপ্তের অন্যান্য মুদ্রায় চক্রধ্বজ কেন পাওয়া যায় না—এ প্রশ্নের সমাধান করাও কঠিন হয়।

সমস্ত কথা আলোচনা করে, কাচ সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন—এই কথাটাই সমীচীন মনে হয়। আর একটা মত আছে, কাচ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্ত কাচের স্মৃতিতে ঐ মুদ্রা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু এ মত নিতান্তই কাল্পনিক। তাছাড়া ভারতবর্ষে স্মৃতিসূচক মুদ্রার ঐতিহ্যের কোনো দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনের জন্য কাচ যুদ্ধ করেছিলেন। সম্ভবত যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে তিনি কিছুদিন রাজত্বও করেছিলেন। তাঁর মুদ্রা খুব কম পাওয়া গেছে, তার দ্বারা এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় যে অল্পকাল শাসন করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা তৈরি করাতে পারেন নি। শাসনের প্রতীকস্বরূপ মুদ্রা প্রচলন আবশ্যক হওয়ায় কাচ নিজ নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা তৈরি করিয়েছিলেন কিন্তু শিলালিপি খোদাই করানো তেমন আবশ্যক কার্য বলে মনে না হওয়ায় আমরা তাঁর রাজ্যকালের কোনো লিপি পাইনি। গুপ্তবংশের লিপিতে বংশের সব শাসকের নাম তালিকা থাকত না, যাঁদের পুত্রপৌত্ররা রাজ্য পেয়েছিলেন বংশ তালিকায় কেবল তাঁদেরই নাম দেওয়া হ'ত। যেহেতু সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্রপৌত্ররা সিংহাসন লাভ করেছিলেন, সেইজন্য কাচের নামের উল্লেখ গুপ্তবংশের শিলালিপিগুলিতে করা হয় নি।

আর্যমঞ্জু-শ্রীমূলকল্পের বৌদ্ধ গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্তের ভাই ভস্মের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। ভস্ম কাচেরই মত অন্য আর এক ভাই,

সুতরাং আমরা এই গ্রন্থের উল্লেখকে কাচের জন্য ব্যবহার করতে পারি। এই গ্রন্থেও ভস্ম বা কাচের শাসনের উল্লেখ আছে। কিন্তু সময়ের দূরত্বের জন্য অথবা পাঠের অশুদ্ধতার জন্য এই গ্রন্থে ভস্মকে সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী বলা হয়েছে ও তাঁর রাজ্যকালকে গৌরবপূর্ণ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বলা হয়েছে ; ফলে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের সীমা অবিশ্বাস্যরূপে কম করে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রদত্ত অন্য অনেক কথাই অশুদ্ধ বা কল্পিত বিবরণ বলে সেগুলির গুরুত্ব না দিয়ে আমরা কেবল এইটুকু মেনে নিতে পারি যে, এরদ্বারা সমুদ্রগুপ্তের একজন ভাইয়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের জন্য যুদ্ধের কারণ এই ভাই-এর অস্তিত্ব।

কয়েকজন পণ্ডিত সমুদ্রগুপ্তের প্রথম জীবনের ইতিহাস অন্যরকমভাবে দাঁড় করাতে চান। কৌমুদী মহোৎসব নামক সংস্কৃত নাটক অনুসারে মগধের ক্ষত্রিয় রাজা সুন্দর বর্মা নিঃসন্তান হওয়ায় চণ্ডসেনকে পোষ্য নিয়েছিলেন। ঐ পণ্ডিতেরা বলেন যে চণ্ডসেনই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। পরবর্তীকালে সুন্দর বর্মার কল্যাণ বর্মা নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যার ফলে চণ্ডসেনের সিংহাসন লাভের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যায়। তিনি মগধের শত্রু ম্লেচ্ছ লিচ্ছবিদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে পাটলিপুত্র অবরোধ করেন। যুদ্ধে সুন্দর বর্মার মৃত্যু হয় এবং চণ্ডসেন তাঁর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুন্দর বর্মার প্রভুভক্ত মন্ত্রীদের সাহায্যে কল্যাণ বর্মা কিষ্কিন্ধ্যা পৌঁছেন। সেখানে তিনি পালিত হন। যথাসময়ে তাঁর পক্ষকে প্রবল করবার জন্য মথুরার রাজা কীর্তিবর্মার কন্যা রাজকুমারী কীর্তিমতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। অত্যাচারী শাসক বলে চণ্ডসেন জনপ্রিয় ছিলেন না। রাজ্যের মন্ত্রীরা চণ্ডসেনকে

অধিকারচ্যুত করবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করেন। যখন রাজা কোনো বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজধানীর বাইরে ছিলেন সেই সময় মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ পেয়ে কল্যাণ বর্মা পাটলিপুত্র অধিকার করলেন। শেষে যুদ্ধে চণ্ডসেন সপরিবারে মারা যান। এই পণ্ডিতদের বক্তব্য, কল্যাণ বর্মা পাটলিপুত্র ছেড়ে বাকাটকদের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাকাটকরাজ প্রবরসেনের সাহায্যেই কল্যাণবর্মা পুনর্বার নিজ রাজ্য ফিরে পান। প্রবর-সেন উত্তর ভারত জয় করে প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে নিজের সামন্ত রাজা করেছিলেন। এইরূপে সমুদ্রগুপ্ত নিজ রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভে বাকাটকদের সামন্তরূপে করেছিলেন। পরে সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রগুপ্ত স্বাধীন হন। তিনি বাকাটকরাজ রুদ্রসেনকে পরাজিত করে নিজের পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

কৌমুদী মহোৎসবের কাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নেওয়ার কারণ নেই। এরমধ্যে এমন কিছু কথা আছে, যা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জীবনকালে ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ মগধের শত্রু লিচ্ছবিদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন। কিন্তু কেবল মাত্র এটিকে ভিত্তি করে সম্পূর্ণ নাটকটিকে ঐতিহাসিকতা সিদ্ধ বলবার যথেষ্ট প্রমাণ নেই। মগধ এবং লিচ্ছবিদের শত্রুতা অত্যন্ত পুরাতন, এজন্য যে কোন নাট্যকার লিচ্ছবিদের মগধের শত্রুরূপে চিহ্নিত করবেন, এটি স্বাভাবিক। চন্দ্রগুপ্ত এবং চণ্ডসেনের নামেও স্পষ্ট পার্থক্য আছে। তাছাড়া নাটকের বর্ণনানুসারে যুদ্ধে চণ্ডসেন সপরিবারে মারা যান কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্য শাসনে পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তিনি সভাসদদের সমক্ষে নিজের পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। সুতরাং কৌমুদী মহোৎসবের ঘটনার ভিত্তির উপর প্রথম চন্দ্র-

গুপ্তের ও সমুদ্রগুপ্তের বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অনুচিত।

কৌমুদী মহোৎসবে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের বাকাটকদের সামন্তরূপে রাজ্য শাসন করার কোনো উল্লেখ নেই। অন্যান্য প্রমাণ থেকেও এ সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না যে, প্রবরসেন সত্যই সমস্ত ভারত জয় করেছিলেন অথবা উত্তর ভারতে তাঁর অধিকার ছিল। বাকাটকদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজয়েরও কোনো উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সকল পণ্ডিতেরা মনে করেন, সমুদ্রগুপ্ত প্রথমদিকে বাকাটকদের সামন্ত রাজা ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য এই যে, সমুদ্রগুপ্তের কতকগুলি মুদ্রায় গঙ্গা অঙ্কিত আছে, আর গঙ্গা বাকাটকদের রাজ চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হ'ত, তাঁরা এই তর্ক উপস্থিত করেন যে কতকগুলি মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের আকৃতি আছে সাধারণ মানুষের মতো, আর কতকগুলিতে তাঁর উপাধি 'রাজা' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গঙ্গাকে বাকাটকদের রাজ চিহ্ন বলে মানবার কোনো কারণ নেই, এবং কেবল এই ভিত্তিতে সমুদ্রগুপ্ত ও বাকাটকদের মধ্যে কোনরকম সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। যে সব মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তকে রাজোচিত বেশ ভূষায় সজ্জিত দেখা যায় না সেগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দেখানো হয়েছে। এটা স্বাভাবিক যে, অনেক সময়ে তিনি রাজোচিত আড়ম্বরমুক্ত থাকতেন। সমুদ্রগুপ্তের নামের সঙ্গে যে ক্ষেত্রে শুধু 'রাজা' উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে অনেক সময় মুদ্রাতে এমন স্থান নেই যে দীর্ঘ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি শব্দটি অঙ্কিত হতে পারে। পণ্ডিতেরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার উৎসাহে এই সাধারণ কথাটি ভেবে দেখেন না যে, এই সব স্বর্ণ মুদ্রা তৈরী করানোর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সমুদ্রগুপ্ত স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন, একজন সামন্ত

রাজার পক্ষে সোনার মোহর তৈরি করা সম্ভব ছিল না। যদি সমুদ্রগুপ্ত সামন্ত রাজারূপে ঐ মুদ্রা তৈরি করাতেন তবে অবশ্যই এগুলিতে তাঁর প্রভু সম্রাটের নাম থাকত।

এইজন্য কৌমুদী মহোৎসবের ভিত্তিতে সমুদ্রগুপ্তের প্রথম জীবনের ঘটনাগুলিকে গড়ে তোলা উচিত হবে না।

বিজেতা

সমুদ্রগুপ্ত নিজের পিতার দ্বারা স্থাপিত ভিত্তির উপর এক সুদৃঢ় সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের জন্যই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানাগুলি অতি অল্প সময়ে বিস্তৃত হতে আরম্ভ হয় এবং শীঘ্রই উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যার ফলে তাঁর প্রভাব অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও কোনো-না-কোনো প্রকারে স্বীকার করতে হয়েছিল।

মনে হয় সমুদ্রগুপ্তের ভাগ্যে ছিল প্রথম হতেই সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। নিজের বংশের লোকদের বিরোধ শান্ত করবার পর শীঘ্রই তাঁকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

তিনি অচ্যুত, নাগসেন এবং গণপতিনাগকে উচ্ছেদ করেছিলেন এবং নিজে পুষ্প নামক নগরে (পাটলিপুত্রে) উৎসব কালে নিজের সৈন্যদের দ্বারা কোতকুলে উৎপন্ন রাজাকে বন্দী করেছিলেন। অচ্যুত অহিচ্ছত্রের (বেরিলি জেলার রামনগরের) রাজা ছিলেন, সেইস্থানে আমরা তাঁর মুদ্রা পেয়েছি। হর্ষচরিতে নাগকুলে উৎপন্ন নাগসেনের উল্লেখ আছে, আর তাঁকে পদ্মাবতীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। হর্ষচরিতে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত নাগসেনেরই উল্লেখ আছে। গোয়ালিয়রে পদম পবায়া নামক স্থানই প্রাচীন পদ্মাবতী। গণপতি নাগ ছিলেন মথুরার রাজা, যেখান থেকে তাঁর মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। 'কোত' নামযুক্ত মুদ্রা পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লীতে পাওয়া গিয়েছে, অতএব এঁদের রাজ্য বোধহয় গঙ্গাতীরবর্তী সমতল ভূভাগের উত্তরাংশেই ছিল।

মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনের জন্য গুপ্তবংশীয় রাজকুমারদের মধ্যে বিবাদ দেখে এই অঞ্চলের রাজারা

ভেবেছিলেন, গুপ্তদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংস করবার যোগ্য সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত এই বিরোধীদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। পুষ্প নামক নগর বলতে কোন্ প্রাচীন নগরের উল্লেখ বোঝায় এবং সমুদ্রগুপ্ত কিরূপ সাফল্যলাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে অনেকরকম সম্ভাবনার বর্ণনা করা হয়েছে। একটি মতে, এই চারজন রাজাকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত ঐ নগরটি জয় করেছিলেন, যেটির নাম ছিল কান্যকুব্জ (অথবা পুষ্পপুর), কারণ ঐ নগরটি ঐ চারজন রাজারই রাজ্যের কাছে ছিল। এও সম্ভব হ'তে পারে যে, এই চারজন রাজাকে হারিয়ে সমুদ্রগুপ্ত পুষ্পপুর অথবা পাটলিপুত্রে উল্লাসভরে প্রবেশ করেছিলেন। পাটালিপুত্র ছিল গুপ্তদের রাজধানী। এরকম সম্ভাবনাও কল্পনা করা হয়েছে যে, এই চারজন রাজা মিলিত হ'য়ে গুপ্তদের রাজধানী পাটলিপুত্র আক্রমণ করেছিলেন, আর সমুদ্রগুপ্তকে নিজ রাজধানী রক্ষার জন্য এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রয়াগ প্রশস্তিতে যেখানে এই প্রথমদিকের যুদ্ধের উল্লেখ আছে সেখানে পুষ্পপুর হতে শুধু কোতকুলীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পুষ্পপুর অথবা পাটলিপুত্রের উপর কোতবংশীয়দের অধিকার ছিল এবং কোতবংশীয় রাজাকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রকে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

কিন্তু এই অনুমান প্রধানত কল্পনাভিত্তিক। প্রয়াগ প্রশস্তি থেকে কেবল এই কথাই জানা যায় যে, এই চারজন রাজার সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধগুলির মধ্যে সময়ের বেশী পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যদি আমরা একথা মেনে নিই যে, অচ্যুত, নাগসেন এবং গণপতি নাগের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে একটি যুদ্ধেই সমুদ্রগুপ্ত বিজয়লাভ করেছিলেন, তবু একথা ঠিক যে

কোতবংশীয় রাজা অপর এক যুদ্ধে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে সমুদ্রগুপ্ত নিজে অংশ নেননি। কোতবংশীয় রাজাকে কত সহজে পরাজিত করা হয়েছিল তাই বোঝাবার জন্য প্রয়াগ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রগুপ্ত নিজে যখন পুষ্প-পুরে (পাটলিপুত্রে) ক্রীড়ারত অবস্থায় ছিলেন সেই সময় সৈন্য পাঠিয়েই কোতবংশীয় রাজাকে বন্দী করিয়েছিলেন।

এখানে আর একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার। পরাজিত রাজাদের মধ্যে নাগসেন এবং গণপতি নাগ যে নাগ বংশীয় ছিলেন তা জানা কথা, অচ্যুতেরও নাগ বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁর মুদ্রায় এবং কোন কোন নাগ মুদ্রায় অদ্ভুত মিল দেখা যায়। হতে পারে, তিনিও নাগ বংশের কোনো উপশাখায় জন্মেছিলেন। সুতরাং প্রথম দিকের এই যুদ্ধ প্রধানতঃ নাগ রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী। গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপনার সময় উত্তর ভারতে নাগ রাজাদের শক্তি সর্বাধিক ছিল। এইজন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁদের বিরোধের আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, নাগ বংশীয়েরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং তার বিধি ব্যবস্থা সমূহের সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাত্য লিচ্ছবি রাজকন্যার পুত্র সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহন তাঁদের মনঃপুত হয়নি।

সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের কয়েকজন রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য নিজের সাম্রাজ্যে সম্মিলিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ন'জনের নাম প্রয়াগ প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই নাম তালিকায় গণপতি নাগ, নাগসেন এবং অচ্যুতের নাম এবং সেই সঙ্গে আর ছ'টি নাম আছে—রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, নন্দিন এবং বলবর্মণ। রুদ্রদেব ছিলেন কৌশাম্বীর রাজা। কৌশাম্বী থেকে এঁর একটি 'শ্রীরুদ্র'

অঙ্কিত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে। মতিলের রাজ্য বোধহয় বর্তমান 'বুলন্দশহর' জেলায় ছিল। এখানে একটি প্রাচীন মুদ্রায় 'মতিল' নাম পাওয়া গেছে। চন্দ্রবর্মনের রাজ্য বাংলা দেশের বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত ছিল। এই জেলায় সুসনিয়া পাহাড়ের উপর তাঁর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।

অন্যান্য রাজাদের রাজ্যের স্থান নির্ণয় করা কঠিন। কয়েকজন পণ্ডিত নাগদত্তকেও নাগবংশীয় রাজা বলে মনে করেন। মথুরার নাগ রাজাদের সঙ্গে এমন কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়, যাঁদের নামের শেষে দত্ত শব্দটি আছে। এরকম আর একটি সম্ভাবনাও আছে যে, তিনি উত্তর বঙ্গের রাজা ছিলেন। চিরাদত্ত এবং জয়দত্ত নামক সামন্ত রাজা যে বংশে পরবর্তী কালে রাজত্ব করেছিলেন, তিনি সম্ভবত সেই বংশেরই ছিলেন। নন্দিনেরও পরিচয় নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁরও নাগবংশীয় হওয়ার সম্ভাবনার কথা তোলা হয়েছে। পুরাণগুলিতে নাগবংশের রাজাদের কারো কারো নামে 'নন্দী' যুক্ত আছে দেখা যায়, যথা—শিশুনন্দি, নন্দিয়শস্। একটি মতানুসারে পুরাণসমূহে উল্লিখিত শিবনন্দী নামক নাগবংশীয় রাজারই উল্লেখ প্রয়াগ প্রশস্তিতে 'নান্দী' নামে করা হয়েছে। বলবর্মনের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি আসামের রাজা ছিলেন এবং সম্ভবত হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক রাজা ভাস্কর বর্মনের পূর্বপুরুষ ছিলেন। আমরা বলবর্মনের সঠিক পরিচয় নির্ণয় করিতে পারি না, তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, বলবর্মন আসামের রাজা ছিলেন না। আসাম আর্য্যবর্তের প্রাচীন সীমানার অন্তর্গত ছিল না; তাছাড়া প্রয়াগ প্রশস্তিতেই কামরূপকে স্বাধীন প্রত্যন্ত রাজ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে সহজেই কল্পনা করা যায় যে, উত্তর ভারতের এই রাজাদের পরাজিত করার জন্য সমুদ্রগুপ্ত কয়েক-

বার যুদ্ধ করেছিলেন সম্ভবত কোনো বিশেষ যুদ্ধে একাধিক রাজা মিলিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত একটি যুদ্ধেই এই সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে-ছিলেন—একথা বলার কোনো ভিত্তি নেই। অন্য মতানুসারে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত এই ন'জন রাজাই নাগবংশীয় ছিলেন, তাঁরা সম্মিলিত ভাবে উত্তর ভারত শাসন করেছিলেন এবং একই যুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পুরাণগুলিতে যে ন'জন নাগবংশীয় রাজার উল্লেখ আছে তাঁরা একসময়ে একসঙ্গে, রাজত্ব করেন নি। তা ছাড়া প্রয়াগ প্রশস্তিতে উল্লিখিত নামের রাজাদের মধ্যে কয়েকজন নিশ্চয়ই নাগবংশীয় ছিলেন, কিন্তু সকলকেই নাগ-বংশীয় বলে স্বীকার করবার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। অন্য আর একটি মতানুসারে এই সকল রাজারা মিলে বাকাটকবংশীয় প্রথম রুদ্র সেনের নেতৃত্বে সমুদ্রগুপ্তের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু কৌশাম্বীর যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে উল্লিখিত রুদ্রদেবকে বাকাটক-বংশীর প্রথম রুদ্রসেন বলে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না।

এবিষয়ে আমরা পরে অলোচনা করব।

অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত সমুদ্রগুপ্তের আর্যাবর্তে যুদ্ধের দুটী উপলক্ষ্য ছিল। প্রথম যুদ্ধে তিনি অচ্যুত, নাগসেন, গণপতি নাগ এবং কোতবংশের একজন রাজাকে পরাজিত করেন এবং পরে দক্ষিণ ভারত অভিযানে যাত্রা করেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে উত্তর ভারতে তাঁর বিরোধী রাজাগণ উপদ্রব আরম্ভ করেন। সেইজন্য সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে তাঁর বিজয় অভিযান অসমাপ্ত রেখে উত্তর ভারতে ফিরে আসেন। এরপর বিরোধীদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ভবিষ্যতে ঐ রকম উপদ্রবের সম্ভাবনা শেষ

করে দেবার জন্য তিনি তাঁদের রাজ্যগুলি নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

সমুদ্রগুপ্তের উত্তর ভারতের যুদ্ধগুলির মধ্যে কতকগুলিকে তাঁর দক্ষিণ ভারতে বিজয় যাত্রার পূর্বে এবং কতকগুলিকে পরে এরূপ মনে করা ঠিক হবে না। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, সমুদ্রগুপ্তের মতো নিপুণ সেনাপতি এবং শাসক উত্তর ভারতে নিজ শক্তিকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত উপদ্রবকারী উপাদানগুলিকে ভালো রকমে দমন না করে দীর্ঘকালের জন্য সুদূর দক্ষিণে প্রস্থান করবার দুঃসাহস করেছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের দ্বারা উত্তর ভারতে এই রকম দু'বার যুদ্ধ করার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, প্রয়াগ প্রশস্তিতে সর্বপ্রথম অচ্যুত, নাগসেন, গণপতি নাগ ও কোতবংশীয় রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। ওর পরে দক্ষিণ ভারতের রাজাদের এবং রাজ্যগুলির তালিকা আছে, তারপর আবার আর্যাবর্তের ন'জন রাজার নাম দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোকের মতে প্রয়াগ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন এবং যুদ্ধের উল্লেখ কালক্রমানুসারে করা হয়েছে। এইজন্য আর্যবর্তের রাজাদের সঙ্গে দুবার যুদ্ধের কল্পনা করা হয়েছে। এই অনুমানের সমর্থনে এও বলা হয় যে, প্রথমেই যে অচ্যুত, নাগসেন ও গণপতি নাগের পরাজয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের নাম, দক্ষিণ ভারতের রাজাদের নামের তালিকার পরে আর্যাবর্তের রাজাদের যে নামগুলি দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে আবার পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত প্রথমবার এঁদের পরাজিত করে এঁদের সঙ্গে কোনো রকম কঠোর ব্যবহার করেন নি, সেজন্য এঁরা দ্বিতীয়বার উপদ্রব করবার সুযোগ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর এঁদের সমূলে নাশ করা

হয়েছিল, আর এঁদের রাজ্যগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধগুলি কালানুক্রমিকভাবে তৈরি করা হয়েছে একথা মনে করা ভুল। আসলে প্রশস্তি রচনাকারেরা সমুদ্রগুপ্ত এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে পাঁচটি বর্গীকরণ করেছিলেন। বর্গীকরণের ভিত্তি কালানুক্রিক ছিল না। ঐ বর্গগুলি বিভিন্ন প্রদেশ এবং সেগুলির প্রতি প্রযুক্ত কূটনীতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। অচ্যুত, নাগসেন এবং গণপতিনাগের নাম যে দু'বার উল্লেখ হয়েছে তার কারণ এই যে, প্রশস্তিলেখক সমুদ্রগুপ্তের সাফল্যের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য প্রথমেই তাঁকে যে-সব বিপত্তি এবং বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেগুলির ভীষণত্ব বর্ণনা করা দরকার মনে করেছিলেন। এইজন্য তিনি ঐ বিরোধীদের প্রথমেই পৃথকরূপে উল্লেখ করেছিলেন। পরে যখন তাঁরা আর্য্যবর্তের পরাজিত রাজাদের তালিকা দিচ্ছিলেন তখন ঐ তালিকা সম্পূর্ণ করবার জন্য আবার তাদের গণনা করেছেন। কেউ কেউ একথা বলতে পারেন যে, যদি আর্য্যবর্তের রাজাদের তালিকা সমস্ত পরাজিত রাজার নাম দেবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে তবে তাতে কোতবংশীয় রাজার নাম পুনরায় কেন দেওয়া হল না? প্রশস্তিকার সত্যই এটা ভুল করেছেন। কিন্তু সমাধান এইভাবে করা চলে যে, আর্য্যবর্তের ন'জন রাজার মধ্যে কোনো একজন কোতবংশীয় রাজা ছিলেন, প্রথম দিকে তাঁর উল্লেখ কোতবংশীয় বলে এবং পরে তাঁর নিজের নাম দিয়ে করা হয়েছে। এও হতে পারে যে, কোতবংশের রাজনৈতিক প্রভাব এবং তাঁদের শক্তি নগণ্য ছিল, সেইজন্য আর্য্যবর্তের অন্য রাজাদের নামের সঙ্গে তাঁর নাম দেওয়া হয়নি, আর আর্য্যবর্তের রাজাদের নামের শেষে

প্রদত্ত 'আদি' শব্দের দ্বারা ওঁদের মতো ছোটো রাজাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উত্তর ভারতে নিজের অধিকার সুদৃঢ় করে নূতন রাজ্য বিজয় লালসায় সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ বিজয়ের চিন্তা করেন। কিন্তু তার পূর্বেই যে রাজ্যগুলি মাঝপথে ছিল সেগুলি জয় করা দরকার ছিল। তিনি এদেরও নিজের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত করে অধীনস্থ করেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত আটবিক রাজাদের নিজের পরিচারক করে রেখেছিলেন। দুটি প্রাচীন লিপিতে ডভালের (আধুনিক জব্বলপুর) কাছে আঠারোটি আটবিক রাজ্যের উল্লেখ আছে। ঐ আটবিক রাজ্যগুলি জব্বলপুরের পূর্বে ছোটনাগপুর থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত এরমধ্যে গাজিপুর এবং জব্বলপুরের মধ্যবর্তী কিছু ভূভাগও যুক্ত ছিল।

এরপর সমুদ্রগুপ্ত নিজের প্রভাব এবং গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রাচীন ভারতের রাজাদের আদর্শানুসারে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হলেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ প্রশস্তিতে দক্ষিণা পথের বারোজন রাজার উপর তাঁর বিজয় লাভের উল্লেখ আছে। তাঁদের নাম এইরূপ :—(১) কোশলের মহেন্দ্র—দক্ষিণাপথের রাজ্যগুলির তালিকায় কোশলের নাম থাকার কারণ—এখানে কোশল বলতে দক্ষিণ কোশলকে নির্দেশ করা হয়েছে। এর রাজধানী ছিল শ্রীপুর। প্রাচীন দক্ষিণ কোশল রাজ্য আধুনিক মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, রায়পুর এবং ওড়িশার সম্বলপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ—সাধারণত পণ্ডিতেরা বাকাটকদের ব্যাঘ্রনামক সামন্ত, যাঁর লিপি মধ্যভারতের 'গঞ্জ' এবং 'নচনে কি তলৈয়া' নামক স্থানে পাওয়া গেছে, তাঁর সঙ্গে এই ব্যাঘ্ররাজকে একই ব্যক্তি বলে ধরেছেন। কয়েকজন পণ্ডিত

এর সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের উচ্চ কল্পবংশীয় ব্যাঘ্ররাজ বলে অনুমান করেন। কিন্তু পণ্ডিতদের অনুমানে গোড়াতেই একটা গলদ এই যে, সমুদ্রগুপ্তের বিরোধী ব্যাঘ্ররাজের উল্লেখ হয়েছে দক্ষিণ ভারতের একজন রাজা হিসাবে, যেখানে প্রস্তাবিত ব্যাঘ্ররাজের রাজ্য বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে। মহাকান্তারকে মধ্যভারত আর বুন্দেলখণ্ড ধরে নেওয়া উচিত হবে না। অতএব বলা যায় যে, ব্যাঘ্ররাজের রাজ্য মহাকান্তার, ওড়িশার জয়পুরের বনে অবস্থিত ছিল। মনে রাখা দরকার, ওড়িশার এই অঞ্চলের এক লিপিতে 'মহাবন' নাম ব্যবহৃত হয়েছে, যে শব্দ মহাকান্তারের সঙ্গে এক পর্যায়বাচক।

(৩) কুরালের মণ্টরাজ—কুরাল কোন জায়গায় ছিল, এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা কয়েকটি অভিমত দিয়েছেন। কয়েকজন পণ্ডিত বলেন, এই স্থানটি মধ্যপ্রদেশের সোনপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। আমরা কুরালকে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার কোল্লাড্ নামক স্থান বলে ধরে নিতে পারি।

(৪) পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি—বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার পিঠারপুর নামক স্থানই ছিল প্রাচীন পিষ্টপুর।

(৫) কোট্টুরের স্বামিদত্ত—কোট্টুরের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়নি, তবে দু'টি সম্ভাবনা আছে। গঞ্জাম জেলায় কোট্টুর আর বিশাখাপত্তনের কোট্টুরের মধ্যে কোনো একটিকে আমরা কোট্টুর বলে মেনে নিতে পারি।

(৬) এরণ্ডপল্লীর দমন—কলিঙ্গের রাজাদের লিপিতে এরণ্ডপল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি ওড়িশার চিকাকোলের কাছে অবস্থিত এরণ্ডপল্লী বলেই স্বীকার করেন। এটি সম্ভবত বিশাখাপত্তনে অবস্থিত এণ্ডিপল্লী নামক স্থানেই ছিল।

(৭) কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ—প্রাচীন কাঞ্চীকে বর্তমান চিঙ্গিলপুট জেলায় অবস্থিত কাঞ্জিবরম নামক স্থান বলা হয়। প্রাচীনকালে কাঞ্চী পল্লববংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। এটিকে ভিত্তি করে বলা চলে, বিষ্ণুগোপও পল্লবংবশীয় রাজা ছিলেন।

(৮) অবমুক্তের নীলরাজ—নীলরাজ অথবা তাঁর রাজ্য অবমুক্ত সম্বন্ধে অন্য কোনো প্রাচীন প্রমাণ থেকে কিছু জানা যায় না। কিন্তু সম্ভবত ঐ রাজ্য কৃষ্ণা নদীর উত্তরে ছিল।

(৯) বেঙ্গীর হস্তিবর্মন্—বেঙ্গীর নাম আজও বেঙ্গী বা পেড্ডবেগীরূপে সুরক্ষিত হয়ে আছে, যা অন্ধ্রপ্রদেশে এল্লোর জেলা থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। অতএব হস্তিবর্মন্‌কে শালঙ্কায়ন বংশের বলে মেনে নিতে কোনো বাধা হতে পারে না। পেড্ডবেগী থেকেই শালঙ্কায়ন বংশের হস্তিবর্মনের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

(১০) পালবক্কের উগ্রসেন—পালবক্ক সম্ভবত কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে নেল্লোর জেলায় অবস্থিত ছিল। পল্লব সাম্রাজ্যের একপ্রান্তের রাজধানী 'পলক্কদ'এর সঙ্গে একে অভিন্ন মনে করা হয়। এইজন্য কয়েকজন পণ্ডিত পালবক্কের শাসনকর্তা উগ্রসেনকে পল্লবদের সামন্ত রাজা বলে মনে করেন।

(১১) দেবরাষ্ট্রের কুবের—দেবরাষ্ট্রের নামও কলিঙ্গের রাজাদের লিপিতে এসেছে। এটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তন জেলার এল্লমংচিলি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

(১২) কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়—মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরে আর্কট জেলার পোলুর নামক স্থানের নিকট অবস্থিত কুট্টলুরকে কুস্থলপুরের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়।

সাধারণত পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেন যে, দাক্ষিণাপথের রাজাদের নাম রাজ্যগুলির ভৌগোলিক

অবস্থানের ক্রমানুসারে দেওয়া হয়েছে এবং এই ক্রমানুসারেই সমুদ্রগুপ্ত এঁদের জয় করেছিলেন। এই ভিত্তিতে আমরা সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণী অভিযানের পথ নির্ণয় করতে পারি। পাটলিপুত্র থেকে যাত্রা করে সমুদ্রগুপ্তের সৈন্য মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ এবং ওড়িশার উত্তরাংশ জয় করতে করতে ওড়িশার বনময় অঞ্চল হ'য়ে সমুদ্রতীর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন বলে মনে হয়। সেখান থেকে পূর্বসমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে তারা বোধহয় পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীতে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত সৈন্যেরা কাঞ্চীর দক্ষিণদিকে আর যায়নি, আর সম্ভবত ঐ পথেই রাজধানীতে ফিরে ছিল।

প্রয়াগ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথের সমস্ত রাজাদের (সর্বদক্ষিণাপথরাজ) হারিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রশস্তিতে এই বারোজন রাজারই নাম দেওয়া হয়েছে। এদের রাজ্য দক্ষিণাপথের পূর্ব আর উত্তরপূর্ব পথেই স্থিত ছিল এবং সমুদ্রগুপ্ত কেবল ঐ অঞ্চলগুলি জয় করেছিলেন। এঁদের নাম আলাদা করে এবং বিস্তৃতভাবে দেওয়ায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সমুদ্রগুপ্ত অবশ্যই এই রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, না হ'লে তিনি সম্পূর্ণ দক্ষিণাপথ বিজয়ের দাবী করতেন।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথের এই রাজাদের সঙ্গে পৃথকভাবে যুদ্ধ করেন নি। এই সমস্ত রাজা সম্মিলিতরূপে একটি যুদ্ধেই সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু প্রয়াগ প্রশস্তি থেকে এই রাজাদের একটি সংঘ রূপে সংগঠিত হওয়া সমর্থিত হয় না। দুব্রিয়া মহাশয় বলেন যে, প্রথমে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ কোশল আর ওড়িশার কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজ্যকে পরাজিত করতে সফল হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত পৌঁছোলেন তখন

পূর্ব দক্ষিণাপথের রাজাদের এক শক্তিশালী সংঘ কাঞ্চীর শাসক বিষ্ণুগোপের নেতৃত্বে সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে বিরোধিতা করলেন। সমুদ্রগুপ্ত হেরে গেলেন। সেইজন্য তিনি পশ্চিমদিকে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁকে পূর্ব বিজিত রাজ্যগুলি ছেড়ে দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণী অভিযান উত্তর ভারতের এক সম্রাটের দক্ষিণ বিজয়ের নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

ডুব্রিয়া সাহেবের এই মত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না। এই মতে এই সত্যই দেখানো হচ্ছে যে, পূর্ব উপকূলের কয়েকজন রাজা সম্মিলিতভাবে সমুদ্রগুপ্তের বিরোধিতা করে-ছিলেন। আমরা দেখছি, দক্ষিণাপথের রাজাদের তালিকায় এরণ্ডপল্লীর দমনের নাম পর্যন্ত ভৌগোলিক ক্রমানুসারে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁর পরের নামগুলিতে ঐ ক্রম রক্ষা করা হয়নি। এই নামগুলিতে কাঞ্চীর বিষ্ণু গোপের নাম সর্বাগ্রে লিখিত হয়েছে অথচ তাঁর উত্তরেস্থিত বেঙ্গীর হস্তিবর্মনের নাম পরে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, বিষ্ণু গোপ ও তাঁর পরবর্তী উল্লিখিত রাজারা সম্মিলিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখীন হওয়া স্থির করেছিলেন এবং বিষ্ণু গোপ এই সংঘের নেতৃত্ব করে-ছিলেন। বিষ্ণু গোপের পদের গুরুত্বের জন্যই প্রয়াগ প্রশস্তিতে এই রাজাদের নাম-তালিকায় বিষ্ণু গোপের নাম সর্বপ্রথম দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ডুব্রিয়ার কথামতো, সমুদ্রগুপ্ত এই সংঘের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন—এই অনুমান ভিত্তিহীন। যেকথা আমরা আগে বলেছি, প্রয়াগ প্রশস্তির রচয়িতা হরিষেণ দক্ষিণ ভারতের সমস্ত রাজাদের উপর বিজয়ের দাবী না করে কেবল কয়েকজন রাজার নাম উল্লেখ করে দক্ষিণ ভারতীয় অভিযানে সমুদ্রগুপ্তের সাফল্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের সম্ভাবনা শেষ করে

দিয়েছেন। প্রয়াগ প্রশস্তির স্পষ্ট কথা স্বীকার না করে তার উল্লেখের বিরুদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করার অর্থ হরিষেণকে মিথ্যাবাদী বলা, সেটা উচিত মনে হয় না। হরিষেণ যদি নিজের প্রভু সমুদ্রগুপ্তের মিথ্যা প্রশংসার জন্য কোমর বেঁধে থাকতেন তবে তিনি কেবল বারোজন রাজার উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট হতেন না, তিনি সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতের উপর সমুদ্রগুপ্তের বিজয়ের দাবী করতে পারতেন। তিনি প্রশস্তির সত্যতার পথকে এতে শক্তিশালী করেছেন এবং প্রশস্তিতে যে যথাতথ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে—একথা প্রমাণিত করেছেন।

সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণী অভিযানের পথ সম্বন্ধে সত্যনাথ আইয়র এবং জায়সওয়ালের মত পূর্বোক্ত মত থেকে ভিন্ন। সত্যনাথ আইয়রের বক্তব্য, সমুদ্রগুপ্ত নিজের অভিযানের পথে ওড়িশা, গঞ্জাম এবং বিশাখাপত্তন হয়ে যান নি, পূর্ব উপকূলে তিনি সর্বপ্রথম পিঠাপুরমেই পৌঁছেছিলেন। সত্যনাথ আইয়ারের মতানুসারে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়যাত্রা কেবল পূর্ব উপকূলে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর সৈন্য পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত জয় করেছিল। জায়সওয়ালের মতানুসারে সমুদ্রগুপ্ত ছোটনাগপুর, সম্বলপুর এবং বস্তর হয়ে সোজা বেঙ্গীতে পৌঁছেছিলেন, যা পল্লবদের শক্তির মূল কেন্দ্র ছিল। জায়সওয়াল বলেন, সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব উপকূলের পথ অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রশস্তিতে বিজিত প্রদেশের তালিকায় নিম্নবঙ্গ এবং ওড়িশার কোনো অঞ্চলের নামের অনুপস্থিতি থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়। সমস্ত পরাজিত রাজাই 'কোলৈর' হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত অন্ধ্র এবং কলিঙ্গ প্রদেশের লোক ছিলেন। এই সমস্ত রাজাই একসঙ্গে একই যুদ্ধে পূর্বোক্তরূপে পরাজিত হয়েছিলেন। সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত এরপর আর অগ্রসর হন নি, বিহারে ফিরে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এই দু'জন পণ্ডিতের প্রস্তাবিত অভিযান পথটি মেনে নেওয়া যায় না।

সমুদ্রগুপ্ত অস্থিরচিত্ত রক্তপিপাসু দানবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন যোদ্ধা ছিলেন না। ইতিহাসে এমন অনেক দিগ্বিজয়ীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা নিজেদের প্রভুত্বের ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য ধনজন বিনাশ করতে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির গলা টিপে মারতে কোনো দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত কলঙ্কিত এবং পাশবিক শক্তিতে বিশ্বাসী ঐরূপ বিজেতার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তিনি কেবল যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করতেন না। দক্ষিণভারতের রাজাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার থেকে তাঁর উদারনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়াগ প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত এই রাজাদের পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে এঁদের মুক্তি (মোক্ষানুগ্রহ) দিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্রে এই নীতিকে ধর্মবিজয়ের নীতি বলা হয়। এই নীতি অনুসরণকারী বিজেতা বিজিত প্রদেশকে নিজের রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন না, পরাজিত রাজারা তাঁদের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন—কেবল এতেই সন্তুষ্ট হতেন। এই নীতি দ্বারা বিজেতা শুধু নিজের প্রভাব বৃদ্ধির প্রযত্ন করেন। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দ্বারা এই নীতি অনুসরণের উল্লেখ করেছেন। রঘু ধর্মবিজয়ী ছিলেন, তিনি নিজের প্রতিপক্ষের শ্রী-ই হরণ করতেন, তাঁদের ভূমি নয়; তাঁদের বন্দী করে আবার স্বাধীনতা দিতেন।

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথের রাজ্যগুলিকে জয় করে সেগুলিকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর নীতি দুর্দমনীয় রাজ্যবিস্তারের নীতি ছিল না। এই রাজাদের উপর নিজের শক্তির ছাপ দিয়ে, এঁদের রাজ্যে কোনোরকম হস্তক্ষেপ না করে, এঁদের স্বাতন্ত্র্য এবং অধিকারকে কুণ্ঠিত না

করে—সমুদ্রগুপ্ত নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। একজন পণ্ডিতের মতে 'গ্রহণমোক্ষানুগ্রহ' বাক্যে মাত্র একটি নীতির উল্লেখ নেই। এখানে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ তিনটি পৃথক ব্যবহার বোঝাচ্ছে। দক্ষিণাপথের রাজাদের তালিকার মধ্য থেকে কয়েকজনকে সমুদ্রগুপ্ত বন্দী করেছিলেন (গ্রহণ), পূর্বে যাঁরা অন্যের বশীকৃত বা অধীন ছিলেন এমন কয়েকজনকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন. (মোক্ষ) আর কয়েকজনের উপর কৃপা করেছিলেন (অনুগ্রহ)। কিন্তু প্রয়াগ প্রশস্তি থেকে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রশস্তি থেকে শুধু এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, দক্ষিণাপথের সমস্ত রাজার সঙ্গে সমানভাবে একই গ্রহণমোক্ষানুগ্রহ নীতি ব্যবহৃত হয়েছিল, নাহ'লে প্রশস্তিতে এই রাজাদের নামগুলি, এই তিনরকম ব্যবহার ব্যক্ত করে এমন শব্দ দিয়ে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা হ'ত।

দক্ষিণাপথের রাজাদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত যেরকম ব্যবহার করেছিলেন, তা তাঁর রাজনীতিকুশলতার পরিচায়ক। তিনি পরিস্থিতির অসুবিধাগুলি বুঝতেন। সে যুগে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালোরকম গড়ে ওঠেনি, পাটলিপুত্র থেকে দূর দক্ষিণাপথের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং দরকার হলে সেখানকার কুচক্রীদের দলিত করবার জন্য অবিলম্বে কিছু করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল মনে হয়। সেইজন্য সমুদ্রগুপ্ত এঁদের নিজের প্রভাবাধীন করে হয়তো এঁদের সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বকেই বেশী প্রয়োজনীয় এবং কূটনীতিসম্মত মনে করেছিলেন। দক্ষিণাপথে প্রযুক্ত তার এই নীতি প্রয়োজনীয়তা এবং পরিস্থিতির ব্যবহারিকতার ভিত্তিতেই হয়েছিল।

কয়েকজন পণ্ডিতের মতে সমুদ্রগুপ্তের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে উত্তর ভারতের কয়েকজন রাজা বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিলেন। এঁদের কুচক্রে সম্ভাবিত ক্ষতির আশঙ্কাতেই

তিনি আর অগ্রসর হওয়া উচিত বোধ করেন নি, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যে অব্যবস্থা শান্ত করবার জন্য ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এই অবস্থায় সমস্যাগুলিকে আর বাড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। দক্ষিণাপথের নূতন বিজিত প্রদেশগুলিকে নিজ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করা তিনি নিজের বিরুদ্ধ পক্ষের এবং অসন্তুষ্ট রাজ্যগুলির সংখ্যা হ্রাসের পক্ষে হিতকর হবে মনে করেন নি, আর এইজন্য পরাজিত রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা উত্তর ভারতে দু'বার যুদ্ধের সিদ্ধান্তটি ঠিক মনে হয় না। উত্তর ভারতে নিজের অধিকার এবং সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করবার ইচ্ছাতেই সমুদ্রগুপ্তের মতো কুশল সেনাপতি সম্ভবত দক্ষিণের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত কেন দক্ষিণ ভারত বিজয় করেছিলেন? সাধারণ ভাবে স্বীকার করা যেতে পারে, তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মহত্বের আকাঙ্খাই এই অভিযানের কারণ ছিল—যেমন অধিকাংশ ইতিহাসেই দেখা যায় যে শক্তিমান শাসক নিজের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের সমস্ত সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে থাকেন। সমুদ্রগুপ্তও ঐ উদ্দেশ্য প্রেণোদিত হয়ে দক্ষিণাপথ আক্রমণ করেছিলেন।

একজন পণ্ডিতের মতে, সমুদ্রগুপ্তের সময়ে দক্ষিণ ভারতের পূর্বোপকূলে অনেকগুলি বন্দর সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। এই বন্দরগুলিকে নিজের অধিকারে আনাই সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক দক্ষিণাপথের পুর্বভাগ বিজয় করার লক্ষ্য ছিল। এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করায় সেগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বারা নিজের সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে তাঁর সুবিধা হত। কিন্তু এই সুন্দর অভিমতটি নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথের রাজ্যগুলির

উপর স্থায়ী প্রভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন নি। এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে, দক্ষিণ ভারতের পূর্বউপকূল নিজের অধীনে রাখার জন্য তাঁর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। একটি সম্ভাবনা এও হতে পারে যে, পূর্বোপকূলকে এই ভাবে নিজের প্রভাবাধীনে নিয়ে এসে সমুদ্রগুপ্ত বাকাটকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করতে চাইছিলেন।

বাকাটকদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের কি রকম সম্বন্ধ ছিল? সমুদ্রগুপ্ত কি বাকাটকদের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন? বাকাটকদের বিরুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের কি রকম সাফল্য লাভ হয়েছিল? এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পণ্ডিতেরা সহমত হতে পারেন নি। উত্তর ভারতের সম্রাটের পক্ষে দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগের অধীশ্বরের সঙ্গে উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করার খুবই প্রয়োজন ছিল। আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে জানতে পারি যে, যখনই উত্তর ভারতে কোনো শাসকের অথবা রাজবংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে, তখনই তাঁরা দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। কেউ কেউ ঐ প্রদেশ জয় করেছেন, আবার কারও কারও চেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। দুই পক্ষে মৈত্রীপূর্ণ সম্বন্ধের দ্বারা শান্তি রক্ষা হয়েছে। এরকমও কোন কোন উদাহরণ আছে, যাতে দুইপক্ষে মৈত্রীপূর্ণ সম্বন্ধের দ্বারা শান্তি রক্ষা হয়েছে। যাই হোক ভারতের বিশেষ রকম ভৌগলিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির জন্য উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাপথের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য রাখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সমুদ্রগুপ্ত এই সমস্যার নূতন ও সুন্দর সমাধান খুঁজে বার করেছিলেন। মনে হয় যে সমুদ্রগুপ্ত বাকাটকদের খুঁচিয়ে তোলা উচিত মনে করেননি। তিনি নিজের বিজয় যাত্রার সময় সম্ভবত মনে রেখেছিলেন যে তাঁর দ্বারা যেন বাকাটকদের রাজ্যের

উপর কোনো অনধিকার প্রয়াসের দোষারোপ না ঘটে। বোধ হয় উভয়পক্ষ পরস্পরের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং একে অন্যের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করা উচিত বিবেচনা করেন নি। সমুদ্রগুপ্তের সামনে এমন অনেক প্রদেশ ছিল, যেগুলি জয় করা অথবা যেগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করার দিকে হয় তো তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এই জন্যই বোধ হয় তিনি বাকাটকদের শত্রুতা ডেকে আনা উচিত বিবেচনা করেন নি। কিন্তু দুই পক্ষে পরস্পর মিত্রতার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক সন্ধি হয় নি। যদি বাকাটকদের সঙ্গে এইরূপ কোনো সম্বন্ধ হয়ে থাকত, তবে প্রয়াগ প্রশস্তির রচয়িতা এই সম্বন্ধে মৌন থাকতেন না।

দীক্ষিত এবং জয়সওয়াল প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিতের বক্তব্য এই যে, সমুদ্রগুপ্ত নিজের বিজয় যাত্রা সমূহে বাকাটক সাম্রাজ্যের উপরেও আক্রমণ করে তৎকালীন বাকাটকরাজ প্রথম রুদ্রসেনকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে আমরা এই পণ্ডিতদের সমস্ত যুক্তিই খণ্ডন করতে পারি। বাস্তবে প্রয়াগ প্রশস্তিতে বাকাটক সাম্রাজ্য অথবা সম্রাটের কোনো উল্লেখ নেই।

এই পণ্ডিতদের মতে প্রয়াগ প্রশস্তিতে উল্লিখিত রুদ্রদেবই ছিলেন বাকাটক বংশের প্রথম রুদ্রসেন। কিন্তু ঐ দু'জনকে এক ব্যক্তি বলা চলে না। রুদ্রসেন আর রুদ্রদেবের নামের শেষ পদ এক নয়, তাছাড়া প্রয়াগ প্রশস্তিতে রুদ্রদেবের নাম আর্য্যাবর্তের রাজাদের তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

একথাও উঠেছে যে, সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ বিজয়ের যাত্রা পথে এমন কয়েকটি রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন যেগুলি বাকাটক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এতএব সমুদ্রগুপ্তের এই আক্রমণের ফল স্বরূপ বাকাটকদের সঙ্গে তাঁর অবশ্যই

সংঘর্ষ হয়েছিল মনে হয়। কারণ দক্ষিণ কোশল এবং বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ বাকাটকদের অধিকারে ছিল। এ সম্বন্ধে একথাও বলা হয় যে মহাকান্তারের শাসক ব্যাঘ্র-রাজ বাকাটকদের সামন্ত ব্যাঘ্ররাজই ছিলেন। কিন্তু এ তর্ক যুক্তি সংগত নয়।

দক্ষিণ কোশল এবং অন্ধ্র প্রদেশ প্রথম প্রবর সেনের রাজ্য কালে বাকাটক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শীঘ্রই তারা বাকাটক সাম্রাজ্য হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। যে সময় সমুদ্রগুপ্ত এই অঞ্চল আক্রমণ করেছিলেন তখন এরা বাকাটক সাম্রাজ্যের অঙ্গ রাজ্য ছিল না। আমরা পূর্বে দেখেছি যে মহাকান্তারের রাজা ব্যাঘ্র-রাজকে বাকাটকদের সামন্ত বলা ঠিক নয়। অতএব সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণাপথ আক্রমণ কোনো প্রকারেই বাকাটক সাম্রাজ্য অথবা তার অধীন কোন রাজ্যের উপর আক্রমণ ছিল না।

সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা বাকাটকদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনার সমর্থনে বলা হয়ে থাকে যে, সমুদ্রগুপ্তের এরণ (সাগর, মধ্য প্রদেশ) লিপি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর সাম্রাজ্য ঐ অভিলেখের প্রাপ্তিস্থান পর্যন্ত পৌছেছিল। কিন্তু এখান পর্যন্ত পৌছোতে হলে সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে বাকাটকদের রাজ্য হয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই অনু-মানের কোনো ভিত্তি নেই। এরণ-এর রাজ্য বাকাটাকদের সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত ছিল, এটা প্রমাণিত হয়নি। এরণ পর্যন্ত পৌছোবার জন্য সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে বাকাটাকদের রাজ্য হয়ে যাওয়াও অনিবার্য ছিল না। এরণ পর্যন্ত যাওয়ার দু'টি পথ আছে। একটি কাটনি এবং জব্বলপুর হয়ে, আর চিত্রকুট আর কালঞ্জর হয়ে। দ্বিতীয় পথের অনুসরণ

করে থাকলে সমুদ্রগুপ্ত বাকাটকদের সাম্রাজ্যের কোনো অংশের ভিতর দিয়ে বিজয় যাত্রা করেন নি।

সমুদ্রগুপ্তের হাতে বাকাটকরাজ প্রথম রুদ্রসেনের পরাজিত হওয়ার শেষ, কিন্তু সবচেয়ে প্রবলযুক্তি এই ভাবে দেওয়া হয় যে, তাঁর আগে প্রথম প্রবরসেন সম্রাট উপাধি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু প্রথম রুদ্রসেন ঐ উপাধি ধারণ করেননি। কিন্তু বাকাটকরাজের সম্রাট উপাধি ধারণ করার বা না করার কারণ রাজনৈতিক ছিল বলে মনে হয় না। শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী যে-সব রাজারা বাজপেয় যজ্ঞ করেছেন তাঁরাই সম্রাট উপাধি ধারণের প্রকৃত অধীকারী ছিলেন। শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব থাকাতেই বাকাটকেরা তদনুসারে সম্রাট উপাধি ধারণ করতেন বা করতেন না। প্রথম প্রবর সেন বাজপেয় যজ্ঞ করেছিলেন, অতএব তিনি সম্রাট উপাধি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে প্রথম রুদ্রসেন ঐ যজ্ঞ করতে পারেননি, অতএব তিনি নিজেকে সম্রাট উপাধি ধারণের অনধিকারী মনে করেছিলেন।

সুতরাং বাকাটকদের আর সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তাতে সমুদ্রগুপ্তের জয়লাভের কোনো প্রবল প্রমাণ নেই বলেই মনে হয়।

সাম্রাজ্য

গুপ্তবংশের এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা সমকালীন কোনো রাজার পক্ষেই সম্ভব ছিল না। নিজেদের রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁদের সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে শান্তি ও মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক ছিল। নিজেদের পরিস্থিতি অনুসারে এই রাজারা বোধ হয় বিভিন্ন উপায়ে সমুদ্রগুপ্তের কৃপালাভের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

সর্বপ্রথমে আমরা সেই সব রাজ্যের উল্লেখ করব, যেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বে, উত্তরে এবং পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। প্রয়াগ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, এই রাজ্যগুলির শাসকেরা সর্বপ্রকার কর দিয়ে, আজ্ঞা পালন করে এবং নতি স্বীকারের জন্য নিজেরা উপস্থিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তের প্রচণ্ড শাসন মেনে নিয়েছিলেন। এখানে যে রকম সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, সেরূপ সম্বন্ধ সামন্ত রাজগণ নিজেদের প্রভু সম্রাটের সঙ্গে রক্ষা করে চলতেন। এই জন্য এই রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের সামন্ত রাজ্যরূপে গন্য করাই ঠিক।

আমরা প্রমাণের জন্য ব্যস্ত না হয়ে কল্পনার সাহায্যে একথা বলতে পারি যে, এই রাজ্যগুলি বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করেছিল। সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এই রাজ্যগুলি তাঁর সামন্ত রাজ্য হতে রাজি হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে এ সম্ভাবনাও আছে যে, কতকগুলি রাজ্যকে পরাজিত করবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেটা কাজে প্রয়োগ করবার জন্য সসৈন্যে যাত্রাও করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যের সম্বন্ধে এই কথাই মনে হয় যে, উত্তর ভারতে সমুদ্রগুপ্তের অদ্ভুত বিজয়

সমূহ দেখে তারা তাঁর কাছে অধীনতা স্বীকার করাই শ্রেয় বোধ করেছিল। এই জন্য এও সম্ভব যে, এই সীমান্ত রাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি—যে সময়ে সমুদ্রগুপ্তের সৈন্য কর্তৃক তাদের উত্তর ভারতের প্রভু রাজ্যগুলি বিজিত হয়—সেই সময়ে সেই সীমান্ত রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছিল। সমুদ্রগুপ্ত এই রাজ্যগুলিকে কেড়ে নেওয়া উচিত মনে করেন নি। প্রথমতঃ তিনি নিজের নববিজিত রাজ্যের শত্রু সংখ্যা অকারণে বাড়াতে চাননি। দ্বিতীয়তঃ এই রাজ্যগুলির অস্তিত্ব লোপ না করে তিনি নিজ রাজ্য-রক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করেছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে কতকগুলি বিদেশী শক্তির অস্তিত্ব তখনও ছিল। সীমান্তের রাজ্যগুলিকে সামন্ত রাজ্যরূপে রেখে দিলে এই লাভ ছিল যে, যদি কখনও এই বিদেশী রাজ্যগুলির দ্বারা আক্রমণ ঘটে, তবে গুপ্তসাম্রাজ্যের উপর সোজাসুজি তার আঘাত পড়বে না। সীমান্তস্থিত সামন্ত রাজ্যগুলি যেন গুপ্তসাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য প্রাচীরের মতো ছিল।

এদের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যের শাসকদের তো স্পষ্টই 'প্রত্যন্ত নৃপ' বলা হয়েছে। এই পাঁচটি রাজ্য ছিল সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল এবং কর্তৃপুর। সমতট বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বভাগে ছিল। ডবাক রাজ্য বোধ হয় ছিল আসামের নওগাঁ জেলায় যেখানে আজও ডোবোক নামে একটি জায়গা আছে। কামরূপ রাজ্য তো প্রসিদ্ধই, সেটি ছিল আসামের উত্তর দিকে। নেপাল রাজ্যও সুপরিচিত। জালন্ধর জেলার কার্তারপুর নামক স্থানেই কর্তৃপুর বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং এটা সম্ভব যে, ওর মধ্যে কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং রোহিলখণ্ডের কিছু অংশও যুক্ত ছিল।

প্রয়াগ প্রশস্তিতে সামন্ত রাজ্যের শ্রেণীতে আরও ন'টি

রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সমতট প্রভৃতি পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে 'নৃপ' শব্দ যোগ করা হয়েছে, কিন্তু এই ন'টি রাজ্যের জন্য 'নৃপ' শব্দ প্রযুক্ত হয় নি। এই রকম তুলনামূলক ভেদের দ্বারা বোঝা যায় যে, এই ন'টি রাজ্য বিশিষ্ট জাতি-সমূহের গণতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম অন্যান্য প্রমাণ থেকেও জানা যায়। এইগুলি গণরাজ্য রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই রূপেই এদের ইতিহাসের গৌরবময় ঐতিহ্য চলে আসছিল। ভারতীয় ইতিহাসের গোড়া থেকেই আমরা গণতন্ত্রাত্মক এবং রাজতন্ত্রাত্মক রাজ্য সমূহের মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে পাই। খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই সংঘর্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মগধের সাম্রাজ্যবাদের কাছে এই গণরাজ্যগুলিকে কিছুকালের জন্য হার মানতে হয়েছিল। মগধের শক্তি ক্ষীণ হতেই এই রাজ্যগুলি আবার নিজেদের পুরানো শক্তি ফিরে পেয়েছিল। বিদেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে দীর্ঘকালের সংঘর্ষেও এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি ভাগ নিয়েছিল, ও গুপ্তবংশের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং রাজ্য বিস্তারের জন্য এই গণরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় ইতিহাসে গণরাষ্ট্র-গুলির রাজনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে স্বীকৃতির এই শেষ উল্লেখ। এর পরেও কোনো কোনো সূত্রে এদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সব উল্লেখগুলি ওদের অতীত মহত্বের স্মৃতি মাত্র। এর পরবর্তীকালে আমরা কখনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব দেখতে পাইনা। ওদের শক্তিকে দলিত করে দেওয়ায় সমুদ্রগুপ্তের সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

এই গণরাজ্যগুলির মধ্যে মালব, আর্জুনায়ন, যৌধেয়, এবং মাদ্রক গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম দিকে ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে মালবদেরা অতি গৌরবপূর্ণ স্থান আছে।

আলেকজাণ্ডারের সময়ে এরা পাঞ্জাবে ছিলেন। রাবি নদীর তীরে এরা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। পাঞ্জাব থেকে বেরিয়ে মালব জাতি কাছাকাছি অন্যান্য স্থানে গিয়ে বাস করেন। গুপ্তবংশের আবির্ভাবের আগেই এদের প্রভাব খুব বিস্তৃত হয়েছিল। রাজস্থানে মালোয়া প্রদেশের নাম এই মালব জাতির সম্পর্কের জন্যই হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এরা মেবার, টংক আর তার কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করছিলেন। আর্জুনায়নদের রাজ্য সম্ভবত জয়পুরের কাছে ছিল। যে-সব গণরাজ্য বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, যৌধেয়দের নাম তাদের সকলের পুরোভাগে। এদের শৌর্যের খ্যাতি প্রাচীন কালে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এরা যোদ্ধার জাত ব'লে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদের সর্বত্র জয়লাভ দেখে লোকের মনে ধারণা হয়েছিল যে, এদের বিজয় লাভের জন্য কোনো মন্ত্র জানা আছে। বহাওয়ালপুর রাজ্যের সীমান্তে শতদ্রু নদীর দুই তীরে আজও জোহিয়াবার নামক প্রদেশ প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশের নাম যোদ্ধাদের নাম অনুসারে হয়েছে। গুপ্তযুগের আগে এদের রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এদের রাজ্য উত্তরে কাংড়া, পূর্বে সাহারাণপুর এবং দক্ষিণে ভরতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মদ্রক রাজ্যকেও প্রাচীন রাজ্যগুলির মধ্যে গণনা করা হয়। এদেরও অস্ত্রজীবি জাতি বলা হয়েছে। মদ্ররাজ্য পাঞ্জাবে ছিল। এর রাজধানী শাকলই আজকাল শিয়ালকোট নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মদ্ররাজ্য রাবি ও চেনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

শেষ গণরাজ্যগুলি ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে। এদের মধ্যে আভীর প্রদেশ পশ্চিম রাজস্থানে ছিল এবং ঐ স্থান থেকে ছড়িয়ে ওরা বিভিন্নস্থানে পৌছেছিলেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে আভীরদের যে রাজ্যটির উল্লেখ আছে, সেটি ভিলসা

এবং ঝাঁসির মধ্যে অবস্থিত ছিল। আজও এই অঞ্চল আহীরবাড়া নামে প্রসিদ্ধ। প্রার্জুন জাতির রাজ্য ভিলসার কাছেই, সম্ভবত তার উত্তরে ছিল। সনকানীকদের রাজ্যও এই অঞ্চলে ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক একজন সনকানীক সামন্ত রাজার লিপি উদয়গিরির পাহাড় থেকে পাওয়া গেছে। এই পাহাড়গুলি ভিলসার উত্তর পশ্চিম দিকে দু'মাইল দূরে। কাক জাতিয়দেরও এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সাঁচীর নাম কাকনাদ বোট সম্ভবত এজন্যই হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত এই সময় এদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভিলসা থেকে কুড়িমাইল উত্তরে, যেখানে আজও কাকপুর নামক স্থান রয়েছে। খরপরিক জাতিয়দের রাজ্যের ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। তারা সম্ভবত মধ্য প্রদেশের দমোহ জেলাতে থাকতেন।

সীমান্তস্থিত এই রাজ্যগুলি ছাড়া দেশে কিছু বিদেশী রাজ্যও ছিল, যেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। এই বিদেশী রাজ্যগুলি এবং লঙ্কা প্রভৃতি দ্বীপের লোকেও সমুদ্রগুপ্তের প্রচণ্ড প্রতাপ দেখে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। এই রাজ্যগুলির এবং দ্বীপগুলির সঙ্গে কিরকম বিশিষ্ট রাজনৈতিক সম্বন্ধ হয়েছিল এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য কি রকম ভেট প্রভৃতির আদান প্রদান হয়েছিল তা পৃথক ভাবে নির্ণয় করা এবং বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কেবল কয়েকটি রাজ্যের সম্বন্ধে কিছু কথা জানা যায়। আমাদের বিশ্বাস যে, বিভিন্ন উপলক্ষে ঐ রাজ্যগুলির এবং দ্বীপগুলির লোক নানা রাজ্যে দূত পাঠিয়ে ছিলেন। হতে পারে যে, সমুদ্রগুপ্তের গৌরবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই দূতেরা কিছু কিছু এমন কাজও করেছিলেন, যা তাঁদের স্বাধীন সত্তার পক্ষে

অপমানজনক হয়েছিল। আশ্চর্য নয় যে, তাঁদের ঐ রকম ব্যবহার দেখে সমুদ্রগুপ্তের সভাসদেরা ভেবেছিলেন যে এঁরা তাঁদের সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেছেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, এই সব রাজ্য নানা প্রকারে সমুদ্রগুপ্তের সেবা করতেন। তাঁরা নিজেরা সভায় উপস্থিত হতেন, সমুদ্রগুপ্তকে বিবাহ করার জন্য রাজকন্যাদের দিতেন, এবং তাঁর কাছ থেকে নিজ নিজ রাজ্যে রাজত্ব করবার জন্য অধিকার দানকারী গুপ্তবংশের চিহ্নস্বরূপ গরুড় অঙ্কিত আজ্ঞাপত্র চেয়ে নিতেন। এই ধরনের ব্যবহার তো সামন্ত রাজাদেরই উপযুক্ত। স্বাধীন রাজ্যগুলি সাধারণত কখনও এভাবে নিজেদের মর্যদা ক্ষুণ্ণ করে না। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা তো স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাধীন রাজাদের অন্য রাজার সভায় উপস্থিত থাকা অশোভন বলে মনে করা হয়। তাঁদের দূত অবশ্য অন্য রাজ্যে সংবাদ প্রভৃতি নিয়ে যেতে পারে। অথবা এও হতে পারে যে, কোনো বিশেষ কারণে কোনো এক বিদেশী রাজা সমুদ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, আর প্রশস্তিকার তাকে তাঁর অধীনতা স্বীকার বলে বর্ণনা করেছেন। নিজেদের রাজ্য শাসন করবার অনুমতি পাওয়ার জন্য গুপ্তসাম্রাজ্যের কাছ থেকে শাসন পত্র চাওয়া যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তবে তদ্দ্বারা এই রাজ্যগুলি সামন্ত রাজ্য বলেই প্রমাণিত হবে। কিন্তু একথা সত্য বলে মনে হয় না; কেননা আমরা দেখছি যে গুপ্তসাম্রাজ্য এবং এই রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ ও রাজ্যও ছিল। মধ্যবর্তী রাজ্যগুলির উপর সমুদ্রগুপ্তের কোনো প্রভাব ছিল না, অথচ দূরবর্ত্তী ঐ রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এ কি করে সম্ভব হতে পারে? অথচ আমরা এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারছি

না যে, এদের মধ্যে কয়েকটি রাজা কোনো রকম অনুমতি চেয়েছিল এবং প্রশস্তিকার সেই ঘটনাকে এই ভাবে দাঁড় করিয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রশস্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রাজ্য ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধে তারা প্রশস্তিতে উল্লিখিত তিন প্রকার সেবা করেছিল—একথা বলা ঠিক নয়। এই সমস্ত রাজ্যগুলির সম্পর্ককে এখানে সামূহিক রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বিদেশী রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত কুষাণদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকজন পণ্ডিতের মতে কুষাণদের সাম্রাজ্য তিনটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর সে রাজ্যগুলির শাসকদের নাম উপাধি সহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপাধিগুলি হ'ল দেবপুত্র, ষাহি এবং ষাহানুষাহি। দেবপুত্র উপাধি ছিল পাঞ্জাবের কুষাণদের, কুশানদের ষাহিকিদার আর ষাহানুষাহী কাবুল উপত্যকার কুষাণ শাসকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঐ তিনটিকে একটি সংযুক্ত উপাধি বলে মেনে নেওয়া এবং সেই ভিত্তিতে একজন কুশান শাসকেরই উল্লেখ হয়েছে বলে মেনে নেওয়াই সমীচীন। এই কুশান রাজ্যের রাজ্য কাবুল উপত্যকা এবং পাঞ্জাবের কতক অংশ জুড়ে ছিল। এও সম্ভব যে এঁদের রাজ্যের বিস্তৃতি পশ্চিমদিকে আরও কিছু দূর পর্যন্ত ছিল। কুষাণদের কতকগুলি মুদ্রায় সমুদ্র এবং চন্দ্র নাম লেখা পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, কয়েকজন কুষাণ রাজা শুধু সমুদ্রগুপ্তের আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্বই লাভ করেননি, তাঁরা কোনো কোনো অর্থে তাঁর অধীনতাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সে সময় কুষাণ ছাড়া আর দুটি বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করছিল, তারা হ'ল শক আর মুরুণ্ড। শকদের পশ্চিম

ভারতে গুজরাট এবং কাথিয়াওয়াড়ের উপর অধিকার কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছিল। এরা শক ক্ষত্রিয় বা পশ্চিমী ক্ষত্রিয় নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সাঁচী এবং তার কাছাকাছি অন্যান্য প্রদেশেও শক জাতীয় শাসকেরা রাজত্ব করছিলেন। শকদের উপশাখা ষলদ, ষক এবং গড়হরদের কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজ্যের অস্তিত্বও প্রমানিত হচ্ছে। চীনদেশীয় প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, গাঙ্গেয় সমতল ভূমির উত্তর ভাগে মুরুণ্ড জাতির রাজ্য ছিল। মুরুণ্ডরাও বিদেশী, কিন্তু এদের এবং শকদের একই জাতি বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কয়েকজন বলতে চান, প্রয়াগ প্রশস্তি 'শক মুরুণ্ড' কথাটির দ্বারা দুটি পৃথক বিদেশী জাতির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়নি। তাঁরা মুরুণ্ডকে 'স্বামী' অর্থের বাচক শক ভাষার একটি শব্দ বলে ধরে নেন। এই ভাবে তাঁরা শক মুরণ্ড শব্দের মানে 'শকস্বামী' করে এই কথাটিকে কেবল শক ক্ষত্রকদের উল্লেখ বলে মনে করেন। কিন্তু শকমুরুণ্ডের এরকম অর্থ করা ঠিক নয়। এখানে শকদের কেবল একটি রাজ্যের উল্লেখ নেই।

সমুদ্রগুপ্তের ষশ এবং প্রতাপ কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের সীমান্ত পার হয়ে লঙ্কা এবং অন্যান্য দ্বীপেও তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত লঙ্কা এবং অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের এই পরাক্রমশালী সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, লঙ্কায় এই সময় মেঘবর্ণ নামক রাজা রাজত্ব করছিলেন। মেঘবর্ণের ভাই ছিলেন বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থগুলিতে ভ্রমণের জন্য ভারতে এসেছিলেন। বিদেশী হওয়ায় তাঁকে নিজের এই তীর্থ যাত্রায় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। লঙ্কায় ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর

ভাইকে লঙ্কার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সুবিধার জন্য একটি বিহার নির্মাণ করেদিতে বলেন। মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের কাছে বহুমূল্য উপহারসহ একদল দূত পাঠান এবং লঙ্কা হতে আগত যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি বিহার তৈরি করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সমুদ্রগুপ্ত সানন্দে এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের উত্তরদিকে একটি বিহার নির্মান করান। ঐ বিহার নির্মাণের কথা চীন পর্যটক হুয়েনসাংও বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, যখন মেঘবর্ণ বিহার নির্মাণের অনুমতি নেবার জন্য দূতমণ্ডলী পাঠিয়ে ছিলেন তখন উপহার স্বরূপ ভারত সম্রাটের কাছে নিজের দেশের সকল রকম রত্ন পাঠিয়েছিলেন। আমরা সহজেই কল্পনা করিতে পারি যে, সমুদ্রগুপ্তের সভাসদেরাও সম্ভবত লঙ্কা থেকে পাঠানো উপহারের এই রকমই অর্থ করেছিলেন। বিহার তৈরি করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা আর সেই সম্পর্কে পাঠানো উপহারকে সমুদ্রগুপ্তের গৌরব গাথা গায়ক কবি নিজের রাজ্য শাসন করবার অধিকার প্রার্থনা রূপে কল্পনা করেছেন।

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহের অধিবাসীদের কাছেও আদৃত ছিলেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে যখন সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা নানাভাবে সমুদ্রগুপ্তকে সেবা করার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তখন বাস্তবে এই দ্বীপসমূহকে মনে রেখেই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতো এখন সকলেই জানেন যে, প্রাচীন কালে সাহসী ভারতীয়েরা ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রসারের জন্য এই দ্বীপগুলিতে গিয়েছিলেন। গুপ্ত যুগের মধ্যে এই দ্বীপ-গুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অনেক তত্ত্ব ভারত থেকে এই দ্বীপ-গুলিতে পৌঁছেছিল। যবদ্বীপে রচিত 'তন্ত্রীকামন্দক' নামক

পুস্তকে আদর্শ রাজারূপে সমুদ্রগুপ্তের উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতীয় সাংস্কৃতিতে ওতপ্রোত এই দ্বীপগুলি পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তি প্রচারিত হয়েছিল। অতএব এই দ্বীপগুলির অধিবাসীরা এই মহা প্রতাপবান্ সম্রাটের প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কিছু করেছিলেন—সেটা খুবই স্বাভাবিক। যতদূর মনে হয়, এই দ্বীপগুলির উপর সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব সম্ভবত রাজনৈতিক স্তরের ছিল না। এই সব দ্বীপের রাজারা যে ঐ রকম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন—তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

সুতরাং আমরা দেখলাম যে, সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এবং শক্তির জন্য তাঁর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সুদূর দক্ষিণ এবং কাশ্মীর বাদে দেশের কোনো অংশই তাঁর প্রতাপ থেকে নিজেদের অস্পৃষ্ট থাকতে পারে নি। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত রক্ত পিপাসু অসংযমী দিগ্বিজয়ী মাত্র ছিলেন না। যোদ্ধার চেয়ে বেশী তাঁকে একজন সফল সামাজ্য নির্মাতারূপেই দেখতে পাওয়া যায়। যে নৈপুণ্য এবং কূটনীতি দিয়ে তিনি নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার ও তাকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। তিনি এক দিকে উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্যের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেন, অন্যদিকে অদম্য উৎসাহের ফলস্বরূপ অসম্ভবকে পাওয়ার লোভও তিনি জয় করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম কয়েকটি উদাহরণ আছে যেখানে বিজেতারা, তাঁদের সময় এবং পরিস্থিতির অসুবিধা না বুঝে, সাম্রাজ্য বিস্তারই নিজেদের চরম লক্ষ্য মনে করেছেন এবং এই রকম যুদ্ধে সাম্রাজ্যের শক্তির অপব্যয় করে এবং নিজেদের শত্রুদের সংখ্যা বাড়িয়ে তাঁদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তার অচীরে ধ্বংস হওয়ার

সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ দেশ বিজয় করেও তাকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অপরদিকে নেপাল এবং পূর্ব ও পশ্চিমের পার্বত্য রাজ্যগুলি জয়ের চেষ্টা না করে তিনি—যে ভুলের জন্য মোগল এবং ইংরেজ শাসকদের দীর্ঘকাল অনেক দুঃখদায়ক এবং নিরর্থক যুদ্ধ করতে হয়েছিল—সেইভুল থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। নিজের সাম্রাজ্যের সীমায় সামন্ত রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বজায় রেখে তিনি সাম্রাজ্যের রক্ষাব্যূহ আরও অধিক শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

প্রাচীনকালের যে কোনো শাসকের সাম্রাজ্যের স্বরূপ উপস্থাপিত করবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁকে কেবল তাঁর নিজের দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিই দেখলে চলবে না, তা ছাড়াও তাঁর প্রভাবাধীনে যত রাজ্য আছে সেগুলিকেও গণ্য করাও প্রয়োজন। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের মধ্যে তিন প্রকার প্রদেশ যুক্ত ছিল ; সম্রাটের দ্বারা শাসিত প্রদেশ, সামন্ত রাজ্য এবং মিত্ররাজ্য।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সমুদ্রগুপ্তের নিজের দ্বারা শাসিত রাজ্যের সীমা এইরূপ ছিল বলতে পারি—পূর্বদিকে দক্ষিণ-পূর্বাংশ ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশ। উত্তরসীমা হিমালয় স্পর্শ করত, পশ্চিমে এই সাম্রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং লাহোর ও কর্নালের মধ্যবর্তী জেলাগুলি এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কর্ণাল থেকে এই সাম্রাজ্যের সীমারেখা যমুনার ধারে ধারে চম্বল ও যমুনার সঙ্গম স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখান থেকে নরোয়ারের পশ্চিম হয়ে ঐ সীমারেখা সাগর জেলায় অবস্থিত 'এরণ' নামক স্থানের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ

সীমা এরণ থেকে জব্বলপুর এবং তারপর বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বিস্তৃত ছিল।

দক্ষিণাপথের পূর্বোপকূলস্থ ওড়িষা প্রদেশ থেকে পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী পর্য্যন্ত তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। তাঁর সমস্ত রাজ্য বাংলার দক্ষিণ পূর্বে, আসামে, নেপালে, পাঞ্জাবের জলন্ধর ও শিয়ালকোট জেলাতে, রাজস্থানের জয়পুর, মেওয়ার ও টাংক পর্যন্ত এবং মধ্য প্রদেশ ভিলসা, সাঁচী এবং সম্ভবত দমোহ জেলাতে অবস্থিত ছিল।

পূর্বেই পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে কুষাণ, শক এবং অন্যান্য বিদেশী জাতিরা যথেষ্ট সম্মান দিয়ে তাঁর মিত্রতালাভ করে-ছিলেন। লঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপবাসীরাও সমুদ্র গুপ্তের প্রতাপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এবং প্রভাব বিস্তার দেখে—প্রয়াগ প্রশস্তির উক্তি যে, তিনি নিজ ভুজ বলে সাম্রাজ্য প্রসারের দ্বারা পৃথিবীকে বেঁধে ফেলেছিলেন—আংশিক ভাবে ঠিকই মনে হয়।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল খুবই সমৃদ্ধ ছিল। নিজের শাসনকালে তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁকে আমরা সর্বদাই বীরোচিত কাজে নিযুক্ত দেখতে পাই। তিনি অনেক যুদ্ধে অনেক রাজাকে পরাজিত করে নিজের সাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করেছিলেন অথবা তাঁদের অধীনতা স্বীকার করিয়ে নিজের যশ এবং প্রভাব বৃদ্ধি করেছিলেন। সুতরাং এইরূপ পরাক্রান্ত রাজার রাজ্যকালের ঘটনাবলির সমাপ্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো গৌরবময় যজ্ঞ সমারোহের সঙ্গে হবে এটি স্বাভাবিক। সমুদ্রগুপ্ত নিজের রাজ্যকালের শেষ বৎসরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসে এই রকম অনেক যশস্বী শাসক এবং পরাক্রমশালী

দিগ্বিজয়ী হয়েছেন, যাঁরা অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করে নিজেদের কীর্তিকে অমর করেছেন, কিন্তু কোনো অতিশয়োক্তি বা পক্ষাপাত না করে বলা চলে যে, তুলনামূলক দৃষ্টিতে এই সব রাজাদের অপেক্ষা সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার অথবা ঔচিত্য বহু গুণে অধিক ছিল।

যে প্রয়োগপ্রশস্তি সমুদ্রগুপ্তের যশোগাথায় মুখর, অশ্বমেধের যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ে তা নীরব। অশ্বমেধের যজ্ঞ এমনই সাফল্য সূচক যে প্রশস্তি রচনার পূর্বে সেটা ঘটে থাকলে প্রশস্তিতে তার বিশদ উল্লেখ অবশ্যই থাকত। প্রশস্তিতে ঐ রকম কোনো বিবরণের অভাব থেকে এই সারার্থ করা যেতে পারে যে প্রয়াগ প্রশস্তি রচনা পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করেননি। ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে এই কথার গুরুত্ব আছে। প্রয়াগ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের সমস্ত বিজয় এবং প্রভাববৃদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ আছে। এর সঙ্গে অশ্বমেধের উল্লেখ না থাকায় এই কথাই সূচিত হয় যে, এই সব বিজয় অশ্বমেধের সম্পর্কে করা হয়নি। শাস্ত্রীয় বিধান এই যে অশ্বমেধযজ্ঞকর্তা যে রাজা যজ্ঞ উপলক্ষে ঘোড়া ছাড়েন, তিনিই অশ্বমেধ করতে পারেন। যে-সব বিরোধী রাজা ঘোড়া ধরতেন তাঁদের পরাজিত করে ঘোড়ার রক্ষাকারী সৈন্যদল নিজেদের রাজার প্রভাব এবং শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করত। এই রকম যুদ্ধ এবং জয়লাভ কেবল অশ্বমেধের উপলক্ষেই হ'ত। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধে এই বিধান আক্ষরিক ভাবে পালিত হয় নি। অনুমান করা যেতে পারে যে, যখন সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় শেষ করেছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী অনেক রাজ্যের উপর তার প্রভাব স্থাপিত হয়েছিল তখন তিনি নিজেকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অধিকারী বিবেচনা করে অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

কয়েকজন পণ্ডিত প্রয়াগ প্রশস্তিতে অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের উল্লেখ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁরা প্রশস্তি রচনার আগেই এই মহত্ত্বপূর্ণ সাফল্যের সময় নির্ধারণ করেছেন এবং এই রকম করে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় যাত্রার সঙ্গে অশ্বমেধের গভীর সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি অনুসারে এরণ-লিপির 'সুবর্ণ দান' এর উল্লেখ এবং নালন্দা ও গয়ার তাম্রশাসনে সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধে প্রযুক্ত অনেক 'গোহিরণ্যকোটিপ্রদ' বিশেষণ এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। দিবাকর নামক পণ্ডিত প্রয়াগ প্রশস্তিতে যেখানে সমুদ্রগুপ্তকে 'কৃপণদীননাথাতুরজনোদ্ধরণসন্ত্র-দীক্ষাভ্যুপগতমনসঃ' বলা হয়েছে, সেখানে সন্ত্র শব্দের শুদ্ধরূপ সত্র বলে ধরেছেন এবং এইভাবে এই বাক্যটিকে অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। গোখলের মতে এই প্রশস্তিতে অন্য রাজাদের দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার উপলক্ষে ভেট প্রভৃতি দেওয়ার যে উল্লেখ আছে, সেগুলি আসলে অশ্বমেধ উপলক্ষে ঘটেছিল। কিন্তু এই অভিমতগুলির বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করেও এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তা'হলে প্রশস্তিতে ঐ রকম মহত্ত্ব-পূর্ণ কাজের স্পষ্ট এবং বিশদ বিবরণ থাকত, অস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত মাত্র থাকত না।

অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ যশ এবং গৌরবের স্মৃতিকে স্থায়ী করে রাখবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত ঐ উপলক্ষে প্রচুর পরিমানে স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করিয়েছিলেন। এই মুদ্রাগুলি নিজেদের সৌন্দর্য এবং কলাকৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই মুদ্রার উপর অঙ্কিত আকৃতিগুলি দেখে আমরা অশ্বমেধ দৃশ্যের খানিকটা কল্পনা করতে পারি। এ থেকে বোঝা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রোক্ত বিধি সম্যকরূপে পালন

করেছিলেন। এই মুদ্রাগুলির সামনের দিকে যজ্ঞের ঘোড়া যজ্ঞস্তম্ভের (যূপের) সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখানো হয়েছে। শাস্ত্রানুযায়ী ঘোড়ার কেশরে এবং লেজে একশ' মুক্তা পরানো হয়। মুদ্রায় অঙ্কিত ঘোড়ার চুলে মুক্তা পরানো আছে দেখা যায়, যা শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন করা বোঝায়। যজ্ঞের ঘোড়াকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হয়েছিল। মুদ্রাতে ঘোড়ার পিঠের উপর মুক্তার একটি হালি দেখা যায়। ঘোড়ার নীচে সিদ্ধ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 'সি' লেখা আছে। ঘোড়াটি একটি বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। মুদ্রায় যূপের নীচের অংশের কিছুটা বেদীর ভিতর এবং কিছুটা বাহিরে আছে। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যদি যূপের অবস্থান এই রকম হয় তাহ'লে যজ্ঞকর্তা সংসারে এবং পরলোকে—উভয় লোকেই যশোলাভ করবেন। সমুদ্রগুপ্তের জীবনে এইরূপ লক্ষ্যই ছিল। উপরের দিকে অঙ্কিত লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রাজাধিরাজ, যিনি অশ্বমেধ করেছেন, তিনি পৃথিবীকে রক্ষণ করে (অথবা জয় করে) স্বর্গকে প্রাপ্ত হচ্ছেন (রাজাধিরাজঃ পৃথিবীম্ জিত্বা যো বিজিত্য) দিবেং জয়ত্যাহৃত বাজিমেধঃ)। শাস্ত্রীয় বিধান আছে যে যূপের তলার মাটি পিটিয়ে সমতল করা চাই, কিন্তু মুদ্রায় যূপের নীচে দুটি সিঁড়ির ধাপযুক্ত একটি চাতাল দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রগুপ্ত এই শাস্ত্রীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন, একথা বলা ঠিক হবে না। মুদ্রায় যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তা সম্ভবতঃ এই জন্য যে, সমতল ভূমিতে যূপ দেখানো কলাসম্মত হ'ত না। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যূপের মধ্য ও অন্ত্যভাগ হেলিয়ে আঁকা হয়েছে। যূপের মাঝখানে লাগাম আছে, আর তার দুই মাথা নীচে ঝুলছে। শাস্ত্রীয় নিয়ম মতো যূপ অষ্টকোন যুক্ত হবে আর লাগামের দুই মাথা যূপকাষ্ঠের চার ধার

ঘিরে থাকবে, কিন্তু ছোট মুদ্রাতে বিষদভাবে দেখানো সম্ভব না হওয়ায় মুদ্রায় এগুলি দেখতে পাওয়া যায়না। মুদ্রায় যূপের পতাকা ঘোড়ার পিঠের উপর উড়ছে দেখা যাচ্ছে। শাস্ত্রে যূপের উপর পতাকা দেবার কোন বিধান নেই, কিন্তু রামায়ণে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনাতে পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে রাজমহিষীও অশ্বমেধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে রাণীর সুন্দর চেহারা আছে। তিনি একটি মণিভূষিত মাতুরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দেহ কুণ্ডল, হার, ভুজদণ্ড এবং কঙ্কণের দ্বারা সুশোভিত। শাস্ত্রের আজ্ঞায় রাণী ঘোড়াকে স্নান করাবেন এবং হাওয়া করবেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজমহিষী যে ঐ সব কাজ করেছিলেন, তা বোঝাবার জন্য রাণীর ডান কাঁধে চামর আর বাঁ কাঁধে কাপড়ের টুকরা বা তোয়ালে দেখানো হয়েছে। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ঘোড়ার মৃত্যুর পরে তিনজন রাণী ঘোড়ার শরীর ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে দেবেন, যাতে তলোয়ার তার শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে। রাণীর সামনে যে বস্তু মুদ্রায় অঙ্কিত আছে তা ছুঁচ, যার সাহায্যে সমুদ্রগুপ্তের মহিষী যজ্ঞের ঘোড়ার শরীরে ছিদ্র করেছিলেন বলে মনে হয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার পর সমুদ্রগুপ্ত 'অশ্বমেধ পরাক্রম' উপাধি ধারণ করেছিলেন, যা তাঁর মুদ্রার উল্টা পৃষ্ঠে অঙ্কিত আছে। এই বিশেষণের অর্থ, 'সেই রাজা যাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার শক্তি আছে।' সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার পরে নিজের এই গৌরবময় কীর্তিকে স্মরণীয় করবার জন্য অশ্বমেধ সম্পর্কিত চিহ্নগুলিকে নিজের শীলমোহরেও স্থান দিয়েছিলেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ সংগ্রহালয়ে একটি মাটির

শীলমোহর আছে, যাতে যূপে বাঁধা-এক ঘোড়ার নীচে পরাক্রম শব্দটি লেখা আছে। এই মোহর সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তেরই ছিল। লক্ষ্ণৌর প্রাদেশিক সংগ্রহশালায় একটি ঘোড়ার ছবির উপর পালিত 'গুত্তস্য দেয়ধংম' লিখন পাওয়া যায়। এই অসম্পূর্ণ লিপিটি সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধের স্মৃতিতেই অঙ্কিত হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী শাসকদের লিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে 'চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্তা' বলা হয়েছে যার অর্থ, "যে অশ্বমেধ যজ্ঞ বহুকাল বন্ধ ছিল তিনি তা আবার সম্পন্ন করলেন" কিন্তু স্বয়ং সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় বা লিপিতে সমুদ্রগুপ্তের জন্য এরকম দাবী করা হয়নি। সমুদ্রগুপ্তের আগেও ইতিহাসে অশ্বমেধযজ্ঞকারী কয়েকজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে শুঙ্গবংশীয় পুষ্যামিত্র ভারশিববংশীয় ভবনাগ এবং বাকাটকবংশীয় প্রথম প্রবরসেনের নাম করা যেতে পারে। ভবনাগ এবং প্রবরসেনের রাজ্যকাল এবং সমুদ্র-গুপ্তের শাসনকালের মধ্যে সময়ের পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। অতএব সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধকে বহুকাল পরে পুনরুদ্ধার করবার মর্য্যদা দেওয়া ঠিক হবে না। তাঁর বংশের লোকের এই দাবী অতিরঞ্জিত। তবে এও সম্ভব হতে পারে যে মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের ফলে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রচলন যে রকম কমে গিয়েছিল, তাতে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধার হওয়ার পর আবার অশ্বমেধের প্রচ-লনের দাবী করা স্বাভাবিক ছিল। পুষ্যমিত্রের সম্বন্ধেও ঐ রকম কথা বলা হয়েছে। আর একটি সম্ভাবনা এই হতে পারে যে 'চিরোৎসন্ন' শব্দ বোঝাচ্ছে যে দীর্ঘকাল থেকে এই যজ্ঞের বহু মূলতত্ব এবং ক্রিয়াগুলির লোপ হয়েছিল, এবং যজ্ঞটি আদিযুগের বিশুদ্ধ রূপে সম্পন্ন করা হতো না।

সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে এই দাবী করা হয়েছে যে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞটিকে তার মৌলিক রূপে সম্পন্ন করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার, —যাঁর বাকাটকবংশীয় দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল,—পুনা তাম্রশাসনে সমুদ্রগুপ্তকে 'অনেকাশ্বমেধযাজী' অর্থাৎ অনেক 'অশ্বমেধযজ্ঞকারী' বলা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁর বংশধরদের লিপিতে ঐরকম উক্তি নেই। পুনা তাম্রপত্রের লিপির প্রমাণ এজন্যও সন্দেহজনক মনে হয়। তাম্র লিপিতে এমন কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি আছে যে, অন্য প্রমাণের সমর্থন ছাড়া এটিকে প্রামানিক ভিত্তি বলে যেন মেনে নেওয়া চলে না। তা ছাড়া এও তো স্বাভাবিক নয় যে, যে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালের অধিকাংশ সময় বিজয় যাত্রাতে অতিবাহিত হয়েছিল তিনি নিজের শাসনকালের শেষ কয়েক বছরে একাধিক অশ্বমেধযজ্ঞ করার অবসর পেয়েছিলেন।

ব্যক্তিত্ব

স্বভাবতই কৌতূহল হয়, যে ব্যক্তির এত অদ্ভুত কৃতিত্ব ছিল তিনি নিজে কেমন লোক ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কি ছিল। সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে বহু গুণের সমন্বয় হয়েছিল, একথা তাঁর কীর্তিময় ইতিহাস পাঠে সহজেই বোঝা যায়। প্রয়াগ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, এমন কোন গুণ থাকতে পারে না—যা তাঁর মধ্যে নেই। 'একে প্রশস্তিকারের অন্ধ ভক্তির প্রেরণায় রচিত মুগ্ধ প্রশংসা মাত্র বলা ঠিক হবে না। সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে অনেকগুণ যে ছিল, একথা অবশ্য স্বীকার্য। সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি তাঁর মুদ্রাগুলির উপর অঙ্কিত আছে। মুদ্রাগুলির ছোটো আকার এবং ছাপের দ্বারা বাস্তবানুগ প্রতিকৃতির তৈরী করার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যেও আমরা সমুদ্রগুপ্তের আকৃতির কিছু আভাস পাই। এই মুদ্রাগুলিতে তাঁর সুন্দর মূর্তি নানা ভঙ্গীতে দেখা যায়। তাঁর শরীরের সুসমা গঠন এবং বিভিন্ন অবয়বের সুগঠিত রূপ তাঁর দেহের জ্যোতি আরও বর্দ্ধিত করেছে। তাঁর শারীরিক শক্তি প্রশংসনীয় ছিল। চার প্রকার মুদ্রায় তাঁর যোদ্ধৃরূপ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। দণ্ডধারী শ্রেণীর মুদ্রার উপর প্রভামণ্ডলযুক্ত দণ্ডায়মান প্রতিকৃতি আছে। তাঁর বাঁ হাতে ধ্বজা আছে। এই মুদ্রার উল্টো পৃষ্ঠে তাঁর শক্তির অনুরূপই গৌরবময় উপাধি 'পরাক্রম' লেখা আছে। 'পরাক্রম' শব্দটি সমুদ্রগুপ্তের প্রিয় উপাধি ছিল মনে হয়। প্রয়াগ প্রশস্তিতেও তাঁকে 'পরাক্রমাস্ত' বলা হয়েছে। ধ্বজাধারী শ্রেণীর মুদ্রার অনুরূপ ধনুর্ধারী শ্রেণীর মুদ্রাতেও সমুদ্রগুপ্তের আকৃতিতে সৈনিক বেশ। পরশুধারী শ্রেণীর মুদ্রায় রাজার

প্রভামণ্ডলযুক্ত দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। তাঁর কোমরের বাঁদিকে তলোয়ার ঝুলছে, আর তিনি বাঁ হাতেই একটি পরশু অর্থাৎ রণ কুঠার ধরে আছেন। মুদ্রার পিছনের দিকে 'কৃতান্ত পরশু' লিখন আছে, যার অর্থ, তিনি কৃতান্ত অর্থাৎ যমের পরশু ধারণ করতে সক্ষম ছিলেন। ব্যাঘ্র শিকারের চিত্রযুক্ত মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের হাতে ধনুর্বান আছে এবং তিনি আকর্ণ জ্যা প্রসারিত করে লম্ফদানে উদ্যত বাঘকে আক্রমণ করছেন দেখানো হয়েছে। বাঘ আঘাত পেয়ে পিছন দিকে হঠছে, আর সমুদ্রগুপ্ত বাঘকে পদদলিত করছেন। মুদ্রার উপরদিকের এবং কখনও কখনও তার উল্টো দিকেও 'ব্যাঘ্র-পরাক্রম' লিখন আছে, যার অর্থ সমুদ্রগুপ্ত বাঘের মতো শক্তি-শালী ছিলেন। অনেকে সন্দেহ করতে পারেন যে, সমুদ্রগুপ্ত বাস্তবিক এত কাছ থেকে ধনুর্বানের সাহায্যে বাঘ শিকার করেছিলেন কিনা। কিন্তু এ তো স্বীকার করা যেতে পারে যে, এই চিত্র তাঁর বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে আঁকা এবং তাঁর মৃগয়ার প্রতি আসক্তির প্রতীকস্বরূপ। সমুদ্রগুপ্তের শারীরিক বল, কৌশল এবং অদম্য সাহসের শ্রেষ্ঠ ও সজীব প্রমাণ অন্য আর কিছু হতে পারে না।

যাঁরা নিজেরা দূরে থেকে সৈন্য চালনা করেন—সমুদ্রগুপ্ত সেরূপ সেনানায়কদের শেণীভুক্ত ছিলেন না। তাঁর নিজের বীরত্বে বিশ্বাস ছিল এবং সেইজন্য তিনি যুদ্ধে অংশ নিতেন প্রয়াগ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের ভুজবলকেই নিজের বন্ধু বলে মনে করতেন। এই প্রশস্তিতে আরও কয়েক জায়গায় তাঁর বাহুবলের এবং তারদ্বারা সন্তপ্ত শত্রুদের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, তিনি শত যুদ্ধে অংশ নিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর দণ্ডধারী শ্রেণীর মুদ্রার উপর পৃষ্ঠে অঙ্কিত লিপিতেও শত শত যুদ্ধে তাঁর সাফল্য লাভের

কথা বলা হয়েছে। সেই প্রশস্তিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন হতে পারে, সমুদ্রগুপ্ত সবশুদ্ধ কতগুলি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? এ পর্যন্ত মানতে বাধা নেই যে, অনেক যুদ্ধে অংশ নেওয়ায় যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল, প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে তাঁর শরীরে পরশু, শর, শঙ্কু, শক্তি, প্রাস, অসি, তোমর, ভিন্দিযাল, নারাচ, বৈতাস্তিক প্রভৃতি অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতের শত শত ক্ষত চিহ্ন ছিল এবং সেই ক্ষত গুলির জন্য তাঁর দেহ আরও কান্তিময় মনে হত। এটা অবশ্য কবির কাব্যময় বর্ণনা। সত্যই কি সমুদ্রগুপ্তের শরীরে এত বেশী ক্ষত চিহ্ন ছিল, আর তাতে সত্যই কি তাঁর শরীর আরও সুন্দর দেখাত এটী সন্দেহের বিষয় নিশ্চয়।) কিন্তু আমাদের কাজের জন্য এতটা জানাই যথেষ্ট যে যুদ্ধের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার মূলে যুদ্ধ এবং এই সব আঘাতের চিহ্নে প্রমানিত হয় যে তিনি বহু যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

সমুদ্রগুপ্ত সাহসী যোদ্ধা তথা রণনীতিনিপুণ সেনাপতি ছিলেন। আমরা আগে দেখেছি, একের পর এক যুদ্ধে বিজয়-লক্ষী তাঁর অনুকূল ছিলেন। বিপক্ষ রাজাদের কীর্তি তাঁরদ্বারা পদদলিত হওয়ার উল্লেখ প্রয়াগ প্রশস্তিতে আছে। তিনি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হননি এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো দ্বিতীয় রাজা আর কেউ ছিলেন না। সমুদ্র-গুপ্তের মুদ্রায় এই কথার ইঙ্গিত 'জিতরিপুরজিতো' অথবা 'অজিতরাজজেতাহজিতঃ' 'অপ্রতিরথ' বলে দেওয়া হয়েছে তাঁর এরণ লিপিতেও এই ভাবের দ্যোতক 'অপ্রতিবাবীর্য বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

নিজের বিজয় সমূহে এবং সাম্রাজ্য সংগঠনে সমুদ্রগুপ্ত যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা আমরা

আগেই করেছি। সমুদ্রগুপ্ত জানতেন—কোথায় শক্তির এবং কঠোরতার প্রয়োজন, আর কোথায় নিজের শক্তিকে সংযত করে বন্ধুত্বের জন্য হাত বড়োনো প্রয়োজন। বিবেক বুদ্ধিহীন রাজ্যলিপ্সা দ্বারা তিনি বশীভূত হন নি। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি রকম বিভিন্ন নীতির আশ্রয় নিয়ে তিনি নিজের সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সীমা বিস্তৃত করেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, তিনি অনেক পরাজিত রাজাকে তাঁদের ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এমন অনেক রাজবংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যাঁদের রাজ্যাধিকার অন্যের কবলিত হয়েছিল। যুদ্ধে এত ব্যস্ত থাকলেও তিনি সুচারুরূপে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মত সময় দিতেন। সমুদ্রগুপ্তের সময়ের শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করবার জন্য যথেষ্ট প্রমানিক তথ্য নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তা থেকে এটি স্পষ্ট যে গুপ্তসাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার যে বিশিষ্ট স্বরূপ এই সময়েই নির্ধারিত হয়েছিল! প্রয়াগ প্রশস্তিতে আমরা খাদ্যটপাকিক এবং সন্ধিবিগ্রহিক ছাড়া মহাদণ্ডনায়ক এবং কুমারামাত্য নামক রাজকর্মচারীদের উল্লেখ পাই। কুমারামাত্যের ঐতিহ্য গুপ্তদের দ্বারাই প্রচলিত হয়েছিল। মনে হয় এই রাজপুরুষদের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছিল, যাঁরা বিভিন্ন পদে যোগ্যতাসহ কাজ করবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন।

প্রয়াগ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকে 'প্রচণ্ড' বলা হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা এবং তাঁর নিয়মকানুন কঠোর ছিল বলে সমুদ্রগুপ্তকে অন্যায়কারী বলা যায় না। এই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এরকম নীতি সর্বদা উপযুক্ত ছিল। যে সময়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা হচ্ছিল সে সময়ে কোনোরকম অসাবধানতা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিতে

পারত। কিন্তু শাসন কঠোর হলেও তা বর্বর বা নির্দয় ছিল না। প্রয়াগ প্রশস্তি অনুসারে তাঁর শাসন অসাধুদের পক্ষে নাশকারী এবং সাধুদের আনন্দের কারণ ছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রজাদের সুখ এবং সমৃদ্ধি। প্রয়াগ প্রশস্তির মতে কৃপাপাত্র, দীন, অনাথ এবং আতুরদের উদ্ধারের জন্য তাঁর চিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ছিল।

ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ অল্পই পাওয়া যায়, যেখানে রাজা বীর যোদ্ধা, সফল সেনানায়ক এবং যোগ্য শাসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং বিদ্বান ও কবি, পণ্ডিতদের উপযুক্ত মর্যদাদাতা এবং ললিতকলাসমূহে নিপুণ, তথা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রূপে পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এত গুণের একত্রে এরূপ সমাবেশ সাধারণত দেখা যায় না। যে অল্প সংখ্যক রাজা রাজনিতিক সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের বুদ্ধির, মননশীলতার এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য দেদীপ্যমান হয়ে আছেন, সমুদ্রগুপ্ত তাঁদেরই সমগোত্রীয় ছিলেন।

প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাঁর বুদ্ধির এবং পাণ্ডিত্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর বুদ্ধি শানিত এবং মার্জিত ছিল ও তাঁর পাণ্ডিত্য তত্ত্বের মর্মভেদ করতে পারত। ঈশ্বর তাঁকে জ্ঞানের সঙ্গে কবিহৃদয়ও দিয়েছিলেন, প্রয়াগ প্রশস্তি অনুসারে তিনি সিদ্ধকাম কবি ছিলেন। বলা হয়েছে, তিনি নিজের রচিত বহু কবি তার দ্বারা বিদগ্ধ সমাজে কীর্তির শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে তিনি এমন বহু কাব্য রচনা করেছিলেন যার দ্বারা লেখকও বহু পণ্ডিতদের জীবিকা নির্বাহ হতে পারত এবং সেইজন্য তিনি 'কবিরাজ' উপাধি অর্জন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রগুপ্তের ঐ সুন্দর রচনাগুলি পাওয়া যায় না, সেগুলি প্রাপ্ত হলে তার

সাহায্যে সমুদ্রগুপ্তের কবি হৃদয় এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও কাছ থেকে দেখতে এবং বুঝতে পারা সম্ভবপর হত। অনেকে কৃষ্ণচরিত নামক একখানি বইএর রচনার কৃতিত্ব সমুদ্রগুপ্তকে দেন, কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সমুদ্রগুপ্ত যে কবিতা ভালবাসতেন তার আর একটি প্রমাণ দিতে পারা যায়। ভারতীয় ইতিহাসে মুদ্রার উপর ছন্দবদ্ধ লিপি সর্বপ্রথম গুপ্ত মুদ্রায় পাওয়া যায় আর ঐ ঐতিহ্যের আরম্ভ সমুদ্রগুপ্তই করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রার উপর লিখিত লিপি সুললিত ভাষায় মনোহরভাবে এবং সুন্দর ছন্দে নিবন্ধ। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং এগুলি রচনা করেছিলেন কিনা একথা বলা কঠিন, তবে এগুলির সাহায্যে তাঁর কাব্য প্রীতিস্পষ্ট বোঝা যায়।

সমুদ্রগুপ্ত কেবল নিজে বিদ্বান এবং কবি ছিলেন না, তিনি বিদ্বানদের উপযুক্ত সমাদরও করতেন। প্রয়াগ প্রশস্তির উক্তি মতো পণ্ডিতদের সাহচর্যে তাঁর অন্তর সুখী হত এবং বিদ্যা যাঁর এত প্রিয় তিনি বিদ্বান্‌দের আকর্ষণ কেন্দ্র হবেন এ সম্বন্ধে আশ্চর্য কি? প্রয়াগ প্রশস্তি অনুসারে গুণী ও পণ্ডিত-দের তিনি মহান আদর্শ ছিলেন। বিক্রমাদিত্য এবং ভোজের সম্বন্ধে একথা প্রসিদ্ধ যে, তাঁরা কবিদের প্রচুর পুরস্কার দিয়ে-ছিলেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধেও ঐ রকম বলা হয়েছে। প্রশস্তিকার কবিসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন যে, "নিজের উদরতার দ্বারা তিনি সৎ কাব্যের এবং লক্ষ্মীর মধ্যে যে শাশ্বত বিরোধ তা দূর করেছিলেন।" সমুদ্রগুপ্তের সভার শোভাবৃদ্ধিকারী কবি এবং পণ্ডিতদের তালিকা আমাদের হস্তগত হয়নি, কিন্তু তাঁদের গুণের কিছু আভাষ প্রয়াগ প্রশ-স্তির রচয়িতা হরিষেণের ভাষা এবং ভাবের উপর অধিকার দেখে বোঝা যায়। সাম্রাজ্যে হরিষেণ যে উচ্চপদে অধিকারী

ছিলেন তা কবি এবং পণ্ডিতদের প্রতি সমুদ্রগুপ্তের গুণগ্রাহিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বসুবন্ধু নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক এবং পণ্ডিতও সমুদ্রগুপ্তের আশ্রয় পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। একজন গুপ্তবংশীয় রাজার সভার সঙ্গে বসুবন্ধুকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। তাঁর সময় প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী ধরা হয়। ৩৫০ খৃষ্টাব্দের কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলা হয়। এই অবস্থায় সমুদ্রগুপ্তকে বসুবন্ধুর প্রতিপালক বলে মেনে নেওয়া অনুচিত হবে না। কাব্যালঙ্কারের প্রসিদ্ধ রচয়িতা বামনের বিবরণ থেকে এই সম্ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায়। বামনের মতানুসারে চন্দ্রপ্রকাশ ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং পণ্ডিতদের রক্ষাকর্তা। তিনি বসুবন্ধুকে নিজের মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্তই চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তকেই চন্দ্রপ্রকাশ বলা হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি বসুবন্ধু ও সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রয়াগ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে, পণ্ডিতদের প্রতিপালক রূপে যে রকম বর্ণনা করা হয়েছে, তা দেখে এই কাহিনী সত্য হ'লে আশ্চর্য না হওয়ারই কথা।

বসুবন্ধু ও সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধের কিংবদন্তীকে সত্য বলে মেনে নিয়ে আমরা সমুদ্রগুপ্তের ধর্মবিষয়ক মতামতের বিষয়েতেও কিছু জানতে পারি। এরদ্বারা সূচিত হচ্ছে যে দর্শনের জটিল প্রশ্নতেও সমুদ্রগুপ্তের অসামান্য বুদ্ধি ও রসগ্রাহীতা ছিল। এরদ্বারা এও সূচিত হচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক মত—মতান্তরের কলহ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। অন্য ধর্মের পণ্ডিতদের সমাদর করার ব্যাপারে তিনি ভারতীয় রাজাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সমুদ্রগুপ্তের ধর্মে আস্থা এবং আনুকূল্য তাঁর হৃদয়ের কোমলতা এবং ভাব

প্রবণতার প্রেরণায় হলেও সম্যক জ্ঞান থেকে উৎপন্ন বিশ্বাসের ভিত্তিতে হওয়ায় তা দৃঢ়ও ছিল। প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাঁকে শাস্ত্রের তত্ত্বের অর্থ পালনকারী বলা হয়েছে। গুপ্তযুগের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধর্মবিষয়ক পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের প্রভাবের পুনরুদ্ধার এবং বিকাশও ছিল। গুপ্ত বংশের শাসকেরা এই নীতিটি সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন। তাঁর ধর্মবিষয়ক এইসব আনুকূল্যের জন্য প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাঁর সম্বন্ধে 'ধর্ম প্রাচীর বন্ধ' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। দণ্ডধারী এবং ধনুর্ধারীশ্রেণীর মুদ্রায় রাজা বেদীর উপরে হব্য দানরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। বেদীর যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেই তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীদের পূজাবিধিগুলিও পালন করতেন। বাঘ্রনিহন্তা শ্রেণীর মুদ্রাতে, বাঁ হাতে প্রস্ফুটিত কমল ধারিণী মকর বাহিণী গদার দর্শন পাওয়া যায়।

আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি যে, সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞকে তাঁর বংশের লোকেরা কিরূপ ঐতিহাসিক গুরত্ব দিয়েছিলেন। এর দ্বারা বৈদিক ধর্ম এবং তার সম্পর্কিত যজ্ঞগুলির ক্রিয়াপ্রণালী সমাজে কি রূপ আদৃত ছিল তাহাই সূচিত হয়। গুপ্ত যুগের ধর্মজাগৃতি বৈদিক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহারই প্রতীক। কয়েকজন পণ্ডিত এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে নিজেদের দেখাতে চেয়েছেন—সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ করার কল্পনা এবং প্রেরণাকে নাগ বংশ অথবা দক্ষিণের রাজাদের নিকট পেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্ন নিরর্থক। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সেই সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যে পুনরুদ্ধার হচ্ছিল তা উত্তর ভারতের পরিবেশে উপস্থিত ছিল। এরজন্য কোনো বাইরের কারণ বা প্রেরণার দরকার ছিল না।

সমুদ্রগুপ্ত কেবল ধর্মের বাহ্যরূপ এবং ক্রিয়াকলাপেই আত্মস্থ করেনি। ধর্ম তাঁর অন্তরের অন্তর স্পর্শ করে তাঁর মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল অনুভূতি সমূহের জন্ম দিয়েছিল। আমরা পূর্বেই দেখেছি, তিনি রাজ্য প্রাপ্তির কিছু-কাল পরেই উপদ্রবকারীদের সঙ্গেও কঠোর ব্যবহার করেন নি। তিনি নির্দয়ভাবে পরাজিত রাজাদের রাজ্য কেড়ে নেননি, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাঁকে 'অনুকম্পাবান' বলা হয়েছে। এই লিপি অনুসারে মনে হয় যে তার কোমল হৃদয়কে কেবল ভক্তি এবং বিনম্রতা দ্বারা বশীভূত করা সম্ভব ছিল, আমরা আগেই বলেছি যে, সমুদ্রগুপ্ত দীন দুঃখীদের সুখের ব্যবস্থা করার জন্য সমর্পিতচিত্ত ছিলেন। প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাঁর প্রশংসায় বলা হয়েছে যে, তিনি লক্ষ গাভী দান করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের ললিতকলা সমূহেও বিশেষ অনুরাগ ছিল। কয়েকটি প্রমাণ থেকে আমরা তাঁর সঙ্গীতে আনুরক্তি এবং তাতে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। প্রয়াগ প্রশস্তির উক্তি অনুসারে "গান্ধর্ব কলায় নিজের নৈপুণ্যের দ্বারা তিনি তুম্বুরু এবং নারদ প্রভৃতিকেও লজ্জা দিয়েছিলেন।" সঙ্গীতে সম্ভবত বাদ্যযোগে, বিশেষ করে বীণা যন্ত্র যোগে সঙ্গীতেই তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। প্রয়াগ প্রশস্তির এই প্রশংসা যে মিথ্যা বা কল্পনাপ্রসূত নয় সৌভাগ্যক্রমে আমরা তা প্রমাণ করতে পারি। সমুদ্রগুপ্ত এক বিশেষ প্রকারের স্বর্ণ মুদ্রা তৈরী করিয়ে-ছিলেন যাতে তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় বীনা বাজাচ্ছেন দেখানো হয়েছে। এখানে যে ভাবে রাজাকে যে রূপে চিত্রিত করা হয়েছে; তাতে বোঝা যায় যে, এটি তাঁর নিজের ঘরোয়া জীবনের একটি সত্য চিত্র।

ইংরেজ ঐতিহাসিক স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে ভারতবর্ষের নেপোলিয়ন বলেছিলেন। আজও অনেক পণ্ডিত ঐরকম বর্ণনায় পুনরুক্তি করেন, আর বোধহয় তাঁরা মনে করেন যে এই উক্তির দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের গৌরব বর্দ্ধিত হয়। তুলনা নিশ্চয়ই কিছু কথা বোঝবার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু তুলনা কখনই সর্বাঙ্গীন হতে পারে না। আমরা কখনও কখনও এই সাধারণ নিয়ম ভুলে গিয়ে নিজেদের মনে কতকগুলি ভুলের জন্ম দিই। নেপোলিয়নের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের তুলনা অনুচিত এবং অনাবশ্যক।

নেপোলিয়ান এবং সমুদ্রগুপ্তের তুলনা প্রধানত বিজেতা হিসাবেই করা হয়ে থাকে। দু'জনেই অনেক বিজয়লাভ করেছিলেন এবং বিজিত প্রদেশগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করেছিলেন। বলা হয় যে, দু'জনেই নিজ নিজ যুগের পরিস্থিতির অনুরূপ ভাবে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বিজেতা এবং শাসকরূপে এই দুজনের তুলনা কেবল অনুচিত।

বিজেতা হিসাবেও দু'জনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো প্রভেদ এই যে নেপোলিয়নের যোদ্ধৃ জীবনের শেষ হয়েছিল ওয়াটারলুর পরাজয়ে এবং তারপর দুঃখপূর্ণ ও অপমানজনক পরিস্থিতিতে বন্দীরূপে, কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের বিজয় যাত্রার কাহিনী কোনো রকম পরাজয়ের দ্বারা ব্যাহত হয়নি। সমুদ্রগুপ্তের জীবনের শেষ বর্ষ গুলি সুখ, শান্তি এবং সন্তোষ পূর্ণ ছিল।

ইন্দোরের নিকটবর্তী বনমালা নামক স্থানে প্রাপ্ত সমুদ্রগুপ্তের ধ্বজচিহ্নযুক্ত শ্রেণীর একটি মুদ্রায় শ্রীবিক্রমঃবিরূদ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কোনো কোনো মুদ্রা বিশেষজ্ঞ এটিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বলে মনে করেন যা তাঁর রাজত্বের আরম্ভে তৈরি হয়েছিল এবং যাতে সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রার

উপর ভুলক্রমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার ছাপ অনুযায়ী তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়ে আমরা কেবল এই কথা বলতে চাই যে, নিজের গুণ-রাজি এবং কীর্তিসমূহের জন্য সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে বিক্রমাদিত্য উপাধি সব দিক দিয়েই উপযুক্ত। প্রসিদ্ধ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের যে রকম স্মৃতি আমরা ভারতীয় ইতিহাসে এবং কিংবদন্তিতে পাই, সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিত্বও সর্বথা তাঁর অনুরূপ ছিল। যোদ্ধা এবং দিগ্বিজয়ী হিসাবে যে সব গুণ আবশ্যক, তা ছাড়া বিক্রমাদিত্যের মতোই সমুদ্রগুপ্তেও আমরা হৃদয়ের এবং বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে উদারতা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণও দেখতে পাই। যদি আমরা বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করি তাহলে বিক্রমাদিত্যের পর যে সকল ভারতীয় রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকেই এই উপাধির সর্বাপেক্ষ অধিক সার্থক এবং সমুচিত অধিকারী বলে স্বীকার করতে হবে। আমরা যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিকতা স্বীকার না করি তাহলে একথা স্বীকার করা যায় যে, যেসকল ভারতীয় নৃপতির জীবন, কার্যাবলী এবং গুণের ভিত্তিতে সেই বিক্রমা-দিত্যকে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত অন্যতম।

আমরা সমুদ্রগুপ্তকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য গুপ্ত-দের স্বর্ণ যুগের সকল বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলতে পারি। গুপ্তযুগের এই বৈশিষ্ট্যের সূচনা করায় তাঁর দান অতি প্রশংসনীয়।

দার্শনিকেরা পূর্ণ মানবের কল্পনা করেছেন, কিন্তু মানুষ চিরদিনই অপূর্ণ। ইতিহাসের পাতায় যে সব বিজেতা এবং শাসক নিজেদের সার্থকতার ছাপ রেখে গেছেন তাঁদের সম্বন্ধে

একথা আরও বেশী সত্য। সমুদ্রগুপ্তের সাফল্য সমূহ দেখে একথা বলা যায় যে, ইতিহাসে এরকম যে অতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেখা যায় যেখানে মানুষ নিজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে সফল পদক্ষেপ করেছে, সেখানে সমুদ্রগুপ্তের নাম তারমধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। প্রয়োগ প্রশস্তিতে তো সমুদ্রগুপ্তকে শুধু অতিমানব নয়, অংশতঃ দেবতারূপে চিত্রিত করানো হয়েছে। তাঁর কীর্তির স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছোনোর কথা কেবল প্রশস্তিতে নয় মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপিতেও বলা হয়েছে। তাঁর কীর্তিকে চন্দ্র কিরণের মতো শুচি বলা হয়েছে। তাঁর অলৌকিক কর্ম এবং অদ্ভূত উদার চরিত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে, কবি এতেই সন্তুষ্ট হন নি। ভাববিহ্বল হয়ে তিনি এও বলে-ছেন যে, তাঁর যশ গঙ্গাজলের মতো তিন লোক পবিত্র করছে। তিনি সমুদ্রগুপ্তের তুলনা কুবের, বরুণ, ইন্দ্র এবং যমের সঙ্গে করেছেন। আরো অগ্রসর হয়ে প্রশস্তিকার এ পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য দেহধারী দেবতা ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় জীবন-চরিত মালা

প্রধান সম্পাদক

ডাঃ বালকৃষ্ণ কেসকর

সম্পাদক

অধ্যাপক কে. স্বামীনাথন্ শ্রীমহেন্দ্র বি. দেশা

১।	গুরুগোবিন্দ সিংহ	ডাঃ গোপাল সিং	মূল্য ২·০০
২।	অহল্যাবাই	হীরালাল শর্মা	মূল্য ১·৭৫
৩।	মহারাণা প্রতাপ	রাজেন্দ্র শঙ্কর ভট্ট	মূল্য ১·৭৫
৪।	কবীর	ডাঃ পার্শ্বনাথ তেওয়ারী	মূল্য ২·০০
৫।	পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর	বি. রা. আটবলে	মূল্য ১·২৫
		অনুবাদক—হরিদামোদর ধুলেকার	
৬।	পণ্ডিত ভাতখণ্ডে	শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতন জনকার	মূল্য ১·২৫
		অনুবাদক—অমিতাভ মিশ্র	
৭।	ত্যাগরাজ	অধ্যাপক সাম্বমূর্তি	মূল্য ১·৭৫
		অনুবাদক—আনন্দীলাল তেওঁয়ারী	
৮।	রহিম	সমর বাহাদুর সিংহ	মূল্য ১·৭৫
		অনুবাদক—সুমঙ্গল প্রকাশ	
৯।	রাণী লক্ষ্মীবাই	বৃন্দাবন লাল বর্মা	মূল্য ১·৭৫